আলপনা আর শিখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা, ১৪এ টেমার লেন: কলিকাতা

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬২

প্রচ্ছদ শিল্পী
সুধীর মৈত্র

মুদ্রণে
রবীন্দ্র প্রেস
১২ যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ
কলিকাতা-৯

কণা বসুমিশ্রকে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

পরদেশী
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে
নীল লোহিতের চোখের সামনে
অজানা নিখিলে
কপালে ধুলো মাখা
সেই সময়
পূর্ব পশ্চিম, ইত্যাদি

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। সীমা একটা মোটা বই কোলে নিয়ে বসেছিল জানলার ধারে, কিন্তু বইয়ের পাতায় তার মন ছিল না। রাস্তার দিকে চোখ আর কান। এবার সে উঠে গেল বারান্দায়, কিন্তু রেলিং-এর কাছে গিয়ে ঝুঁকলো না। একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজেকে খানিকটা আড়াল করে উঁকি দিল।

ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। প্রথমে নামলো একজন যুবক, তারপর মিলি। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ, হাতেও একটা ব্যাগ। মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেটিকে কী যেন বলেই দৌড় লাগালো বাড়ির মধ্যে। যুবকটি গাড়ির সামনের সীটের বদলে পেছনের সীটে গিয়ে বসলো।

মিলি সব কটা সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। সীমা মনে মনে সিঁড়িগুলো গুনতে লাগলো। তিনতলা পর্যন্ত মোট চুয়ান্নটা। দরজা বন্ধ তবু যেন সীমা প্রত্যেক সিঁড়িতে মিলির পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

দরজায় পরপর তিনবার বেল টিপলো মিলি। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার। মিলি অত ছটফট করলেও ব্যস্ততা দেখালো না সীমা। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুললো।

মিলি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, মা, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

ঠিক অস্বীকার করলো না সীমা, একটু হাসলো।

মিলি চটি দুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে খোলে। ধপাস করে ব্যাগ দুটো নামিয়ে রাখলো। মাথা ঝাঁকিয়ে কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে ফেলে বলল, বড্ড খাটাচ্ছে। আজ অনেক রাত হয়ে গেল। কটা বাজে বলো তো? সাড়ে নটা!

সীমা জিজ্ঞেস করলো, কিসে এলি? ট্যাক্সি?

মিলি বললো, ট্যাক্সি ভাড়া বেঁচে গেল। একজন গাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেল।

সীমা মুখটা ফিরিয়ে নিল। খচ করে একটা অপরাধ বোধ তাকে বিঁধে গেল। সে তো জানেই যে মিলি ট্যাক্সিতে আসেনি, তবু জিজ্ঞেস করলো কেন? মিলি মিথ্যে কথা বলে কি না, সেটা পরীক্ষা করার জন্য? সীমা নিজেও তো মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে।

মিলি ততক্ষণে নিজের ঘরে গিয়েই একটা ক্যাসেট প্লেয়ার চালিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণই তার গান শোনা চাই। মাইনের টাকার অনেকখানিই সে ক্যাসেট কিনে খরচ করে।

সীমা জিজ্ঞেস করলো, খাবার গরম করবো? নাকি তুই এখন চান করতে যাবি?

মিলি দরজার কাছে এসে বললো, একটু পরে খাবো। খিদে নেই। আমি গরম করে নেবো।

—খিদে নেই কেন? আজ তো টিফিনও নিয়ে যাসনি।

—সন্ধ্যেবেলা অনেকগুলো চিংড়িমাছ ভাজা খেয়েছি।

—ওমা! অফিসে চিংড়িমাছ কোথায় পেলি?

বেশ জোরে হেসে উঠল মিলি। কাছে এসে জড়িয়ে ধরলো মাকে।

সীমার চেহারায় মা-মা ভাব নেই, তাকে এখনো মিলির দিদি বলে মনে হয়। একটাও চুল পাকেনি সীমার। চামড়ায় টান ধরেনি। শুধু তার চশমাটা একটু ভারিক্কী ধরনের। সীমার রং বেশ ফর্সা, মিলি অবশ্য তার বাবার রং পেয়েছে, একটু চাপা রং, তবে তার মুখ চোখের ঝকঝকে ভাবের জন্য রঙের কথা মনে পড়ে না।

মিলি বললো, পাশের চাইনিজ রেস্তোরাঁ থেকে বুঝি খাবার

আনানো যায় না? তুমি কি ভাবলে, আমি কারুর বাড়িতে চিংড়িমাছ ভাজা খেতে গেছি?

সীমা বলল, ও, চাইনিজ ফ্রায়েড প্রণ? ওগুলো ঠিক চিংড়ি মাছ মনে হয় না।

মিলি জিজ্ঞেস করলো, আমি ট্যাক্সিতে আসিনি, অন্য লোকের গাড়িতে এসেছি তা জিজ্ঞেস করলে না?

মুখে কিছু না বলে সীমা শুধু ভুরু তুললো।

মিলি দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললো, মেয়ে বেশি রাত করে অফিস থেকে ফিরছে। কেউ একজন গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে কে? নিশ্চয়ই অফিসের বস্। বসের সঙ্গে গোপন প্রেম, গল্পের বইতে এরকম থাকে না? আমার কপালে কি দুঃখ আমার বস্ নতুন বিয়ে করেছে, বউকে ভয় পায়, আমার সঙ্গে তুই তুই বলে কথা বলে!

—সুব্রত তোকে পৌঁছে দিয়ে গেল?

সুব্রতদার দায় পড়েছে! সুব্রতদা পালিয়েছে এক ঘণ্টা আগে। আমি অফিসের একটা অন্য গাড়িতে এলাম। জানো মা, নিচের বাসুবাবু গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, গাড়িটা থামতেই ভেতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন, আমি কার সঙ্গে ফিরছি! আমি ওকে একদিন এমন ঝাড়বো, বাপের নাম খগেন করে দেবো।

—অ্যাই ছিঃ, ওরকমভাবে কথা বলে না!

—আমি কার সঙ্গে ফিরি না ফিরি, তাতে ওর কী আসে যায়?

—আজ কিন্তু তোর সত্যি বড্ড দেরি হয়েছে। লোকে তো ভাবতেই পারে, এতক্ষণ তুই অফিসে কী কাজ করিস!

—ও, তার মানে তোমারও সেই কথাই মনে হয়? তুমিও বুঝি ভাবো, আমি অফিসের নাম করে এতক্ষণ অন্য কোথাও কাটিয়ে আসি?

—মোটেই তা ভাবি না। কিন্তু তুই সকাল সাড়ে নটায় বেরোস, আর ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে নটা বেজে যায়। এ কী রকম অফিস! অন্য কেউ তো এতক্ষণ অফিসে থাকে না!

—তোমার কি ধারণা, অফিসে আমি এতক্ষণ একলা থাকি? আরও সাত-আটজন থাকে, অমিত, বিক্রম এরা সবাই ছিল আজ। অমিতকে এক একদিন রাত এগারোটা পর্যন্তও থাকতে হয়।

—ওরা তো ছেলে। ওরা তবু থাকতে পারে!

—মা, আমি যে-কাজটা করি, সেটা আমাকে মেয়ে বলে দেওয়া হয়নি। মেয়েরা যে কাজ করে, ছেলেরাও সেই কাজই করে। সমান মাইনে দেয়। তা হলে মেয়েরা আগে আগে চলে আসবে আর ছেলেরা বেশিক্ষণ থাকবে কেন? ছেলেরাই বা সেটা মানবে কেন?

—যাই বলিস, মেয়েদের এতক্ষণ অফিসে থাকাটা ভালো দেখায় না।

চাকরি ছেড়ে দিতে বলছো? আমি বাড়িতে বসে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবো?

সীমা আর কোনো উত্তর না দিয়ে ঢুকে গেল রান্নাঘরে। আলোটা জ্বাললো।

দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট, মাঝখানে খানিকটা খাওয়ার জায়গা। রাস্তার দিকের বারান্দাটা বেশ সুন্দর, এখানে দাঁড়ালে সিংহানিয়াদের বাড়ির বাগানটা দেখা যায়। অনেকগুলো বড় বড় নারকোল গাছ। রাস্তার উল্টোদিকেই শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একটা মেস বাড়ি। ওদের কেউ কেউ যখন পাগড়ি খুলে মাথার লম্বা চুল শুকোয়, তখন অদ্ভুত দেখতে লাগে। তবে ওরা লোক ভালো। ওদের জন্য এ পাড়ায় বিশেষ গণ্ডগোল হয় না।

বারান্দায় দুটো পাখির খাঁচা। একটাতে ময়না, অন্যটাতে চন্দনা। ময়নার খাঁচাটা ঢেকে রাখতে হয়, ওরা আলো সহ্য করতে পারে না। চন্দনাটা বেশ ডাকাবুকো ধরনের, সন্ধ্যের পরেও

জেগে থাকে। অনেক দিনের পাখি, তবু এখনো যেন ঠিক পোষ মানেনি, গায়ে হাত দিয়ে আদর করতে গেলে আঙুল কামড়ে দেয়। খুব জোরে কামড়ায় না অবশ্য।

চন্দনাটা এখন চোখ বুজে আছে। মিলি কাছে এসে শিস দিয়ে ওকে জাগাবার চেষ্টা করলো। ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরার মতন পাখিটা পেছন ফিরলো মিলির দিকে।

মিলির শিস শুনে রাস্তা থেকে কে যেন শিস দিয়ে উত্তর দিল।

মিলি রেলিং-এ উঁকি দিয়ে নিচে দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু যে শিস দিচ্ছে, সে আড়ালে আছে। এ পাড়ায় সমবয়েসী ছেলেদের মিলি চেনে, এক সময় সে অনেকের সঙ্গে খেলা করেছে, তারা কেউ এরকম শিস দেবে না। নিশ্চয়ই নতুন কেউ।

রান্নাঘর থেকে সীমা জিজ্ঞেস করলো, তুই বাথরুমে যাবি না?

মিলি বারান্দা থেকে এসে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সীমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সেই দৃষ্টিতে কী যেন রহস্য আছে।

সীমা কৌতুহল আর বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী?

মিলি বললো, তা হলে চাকরি ছেড়ে দেবো?

—আমি কি সে কথা বলেছি? ওদের বলতে পারিস না তোকে একটু আগে আগে ছেড়ে দিতে!

—সে কথা আমি বলতে পারবো না। মা, শোনো—

—কী?

মিলি আবার চুপ করে গেল।

সীমা এবার কিছু একটা আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে বললো, কী, কী হয়েছে? চুপ করে গেলি কেন? কী হয়েছে বল!

মিলি এবার হেসে বললো, আসলে সে রকম কিছুই হয়নি। তোমাকে একটা কথা বলবো, অফিসের কাজের ব্যাপার, কিন্তু তুমি সেটা কী ভাবে নেবে, সেটাই আসল কথা!

—অফিসের কাজ ?

—অফিস থেকে আমাকে হায়দ্রাবাদ পাঠাতে চাইছে। দিন চারেকের জন্য ঘুরে আসতে হবে।

—হায়দ্রাবাদ ? তুই একা যাবি ?

—কাজের জন্য পাঠালে তো সঙ্গে বডিগার্ড দেয় না। নিজের মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না।

—তা বলে তুই হায়দ্রাবাদ একা একা যাবি কী করে ?

—একা যাওয়াটা খুব শক্ত ব্যাপার নাকি ? প্লেনে যাবো, আসবো। অবশ্য ঠিক একা নয়। একজন ফটোগ্রাফার যাবে, হীরেন, তুমি ওকে দেখেছো, একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

—তোদের অফিসে তো আরও কত লোক আছে। তোকেই হায়দ্রাবাদ যেতে হবে কেন ?

—মা, হায়দ্রাবাদে পাঠানোটা আমার শাস্তি নয়। পত্র-পত্রিকার অফিসে এরকম বাইরে যাবার চান্স পেলে সবাই খুশী হয়। বাইরে থেকে কে কী রকম লেখা পাঠাতে পারে, তা দিয়ে মেরিটের বিচার হয়।

—আমি ভেবেছিলাম, পত্রিকার কাজ মানে অফিসে বসে বসে লেখার কাজ। এত দূর দূর জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় !

দূরে দূরে না ঘুরলে খবর আসবে কী করে ?

—সেই কাজগুলো তো ছেলেরা করলেই পারে।

—তোমাকে তো আগেই বলেছি মা, আমাকে মেয়ে বলে চাকরি দেয়নি ! যে-কোনো পুরুষের সমান যোগ্যতা আছে বলেই এই কাজটা পেয়েছি !

—তা বলে কোনো মেয়ে একা একা হিল্লি দিল্লি ঘুরে বেড়ায় না !

—বাবা কলেজে পড়াতেন, তুমি ইস্কুলে চাকরি করো। তোমরা দু'জনেই আরামের চাকরি করছো, বছরের তিন চার মাস ছুটি,

কাজের দিনেও সারাদিনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র। আরও কত লোককে কত শক্ত কাজ যে করতে হয়, সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। মেয়েরা কত জায়গায় যায়। আমাদের অফিসের পিংকি গত ইলেকশনের সময় ইউ পি গিয়েছিল, তখন ওখানে মারামারি চলছিল।

—পিংকির কথা বাদ দে। ওর ঘরসংসার নেই, কোনো কিছুই মানে না। তুই হায়দ্রাবাদে গেলে থাকবি কোথায়?

—কেন, হোটেলে!

—সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার যাবে, সে আর তুই হোটেলে!

—দু'জনে কি হোটেলের এক ঘরে থাকবো নাকি? আমাদের কম্পানি কৃপণ নয়, দু'জনের আলাদা ঘর ভাড়া দেবে।

—শংকরকে বলেছিস?

—শংকরকে……বলেছি…মানে, শংকর জানে।

—শংকরের কোনো আপত্তি নেই?

—মা, শংকর আমার গার্জেন নয়, তুমি আমার গার্জেন। শংকর আপত্তি করতে যাবে কেন?

—কী জানি, তোদের ব্যাপার-স্যাপার আমি কিছু বুঝি না।

—আমি কিন্তু টিকিট কাটতে বলে দিয়েছি।

—ও, তুই তো ঠিকই করে ফেলেছিস আগে থেকে। তা হলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করবার কী দরকার ছিল?

—এখনো টিকিট ফেরৎ দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে কালকেই চাকরি ছেড়ে দেওয়া যায়।

—হায়দ্রাবাদ না গেলেই বুঝি চাকরি ছেড়ে দিতে হবে?

—না, তা নয়। আমি হায়দ্রাবাদ না যেতে চাইলে আরও তিন-চার জন যেতে রাজী আছে। অফিসের কাজের কোনো ক্ষতি হবে না।

—তা হলে তোর যাওয়ার দরকারটা কী? তুই অত দূরে

শুধু শুধু যাবি, আমার ভালো লাগছে না।

—অফিস থেকে যদি আমাকে একটা ভালো কাজ দেয়, যে-রকম কাজ পেলে সবাই খুশী হয়, অথচ আমি যদি সে কাজটা করতে না চাই, তা হলে সেটাতে তো আমার অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়, তাই না? অন্যরা যা পারে, আমি তা পারি না। এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে আমি চাকরি করতে পারি না।

হঠাৎ গলার আওয়াজ অনেকখানি উঁচু করে সীমা বললো, তোর যদি এত যেতে ইচ্ছে হয়, যাবি। আমি বারণ করলেও তুই শুনবি না, তা আমি জানি।

মিলির দিকে আর না তাকিয়ে মিলির আগেই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সীমা।

গানটা থেমে গেছে, ঘরে গিয়ে ক্যাসেটটা উল্টে দিল মিলি। তার মুখে একটা অন্যমনস্ক ভাব। ঘরের এটা সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো। দেয়ালে একটা ছবি একটু বাঁকা হয়ে ঝুলছে, সেটাকে সোজা করলো অনেকক্ষণ ধরে।

মাঝে মাঝে পেছন ফিরে সে বাথরুমের দরজাটা দেখে নিচ্ছে। সে অপেক্ষা করছে মায়ের জন্য।

সীমা বাথরুম থেকে বেরুতেই মিলি বললো, মা, আমি একটু দোতলা থেকে আসছি।

সীমা বললো, এত রাত্তিরে ওদের ওখানে—

মায়ের কথা শুনতেই পেল না মিলি, ততক্ষণে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেছে।

দোতলায় বিপুলবাবুরা আছেন অনেক দিন ধরে। সীমার স্বামী বিনায়কের বন্ধু ছিলেন বিপুলবাবু। এ বাড়ীতে একটা ফ্ল্যাট খালি হওয়ায় বিনায়কই তার বন্ধুকে ডেকে এনেছিল। বিনায়ক মারা গেছে আট বছর আগে। দেখতে দেখতে এতগুলো বছর কেটে গেল। বিনায়ক চলে যাবার পর ভাড়াটা বেশী মনে

হলেও সীমা এই ফ্ল্যাট ছাড়েনি। সীমার দাদা সেই সময় তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, যায়নি সীমা, মেয়েকে নিয়ে সে আলাদাই থাকতে চেয়েছিল। বিপুল আর ওর স্ত্রী মায়া সবসময় অনেক রকম সাহায্য করেছে।

ওদের ফ্ল্যাটে টেলিফোন আছে। মিলি নিশ্চয়ই ফোন করতেই গেল।

মেয়ের সঙ্গে ইদানীং মাঝে মাঝেই ছোটখাটো ঝগড়া হয় সীমার। আগে হতো না। এখন মিলি দিনের অনেকটা সময়ই বাইরে কাটায়, সেইজন্যই কি? বিনায়ক চলে যাবার সময় মিলির সতেরো বছর বয়েস। ঐ বয়েসটা সাংঘাতিক, সদ্য স্কুল ছেড়ে তখন কলেজে যেতে শুরু করেছে মিলি। সীমা তখন যেন সব-সময় মিলিকে ঘিরে রাখতো। মিলিও মাকে ছেড়ে থাকতো না। কলেজের সব গল্প মাকে এসে বলা চাই।

কিন্তু কলেজ আর চাকরি-জীবনের অনেক তফাৎ। মিলি এখন স্বাবলম্বী, সে মায়ের চেয়ে বেশী মাইনে পায়।

সীমা আগে থেকেই স্কুলে পড়াতো, একার রোজগারে তাকে টেনেটুনে চালাতে হয়েছে, কিন্তু কষ্ট সহ্য করতে দেয়নি মিলিকে। বিনায়কের বাবার কাছ থেকেও কিছু টাকা পেয়েছিল সীমা, সে টাকা সবটা খরচ করেনি। মিলি এক্ষুণি চাকরিতে না ঢুকলেও চলে যেত। কিন্তু মিলি লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি করবে না কেন?

মেয়েটা বড় একগুঁয়ে আর চাপা স্বভাবের। দিন দিন যেন দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে।

মিলি ফিরে এসে কোনো কথা না বলে বাথরুমে ঢুকলো। কেন দোতলায় গিয়েছিল কিংবা কাকে ফোন করলো, তা জিজ্ঞেস করতে পারলো না সীমা।

এবার সে খাবার গরম করতে লাগলো। বাথরুমে মিলির

বেশি সময় লাগে না।

জিন্‌স আর টি শার্ট পরে অফিস যায় মিলি, বাড়িতে শাড়ি পরে। এখনকার দিনে সবই উল্টো। মেয়ের পোশাক বিষয়ে অবশ্য কোনো আপত্তি জানায় না সীমা। সে নিজে এক সময় শালওয়ার-কামিজ পরতো বাইরে বেড়াতে গেলে, সেগুলো এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু বিধবা হবার পর আর ওসব পরার প্রশ্নই ওঠে না। মিলি একদিন বলেছিল, মা পাঞ্জাবী মহিলাদের স্বামী মারা গেলে তারা কি শালওয়ার-কামিজ পরা ছেড়ে দেয়?

রান্না সব করাই ছিল, কয়েকটা ছোট ছোট বড়ি ভাজতে লাগলো সীমা। মিলি এই বড়িভাজা ভালোবাসে।

মিলি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বললো এ কী, তুমি রান্না শুরু করেছো? এ বেলা আমার সব করার কথা নয়?

সীমা বললো, হয়ে গেছে।

মিলি টেবিলে দুটো কাচের প্লেট পাতলো। জলের বোতল, গেলাস নিয়ে এলো।

দু'জনে নিঃশব্দে খেতে লাগলো একটুক্ষণ। অন্যদিন মিলি অবিশ্রান্ত কথা বলে।

একটু পরে সীমা জিজ্ঞেস করলো, হায়দ্রাবাদে কদিন থাকতে হবে?

মিলি বেশ অবাক ভাব করে বললো, যাচ্ছি না তো! টেলিফোন করে সুব্রতদাকে না বলে দিলাম!

সীমা প্রায় আঁতকে উঠে বললো, এর মধ্যে না বলে এলি? আমি কি তোকে সত্যি সত্যি বারণ করেছি?

—আমি কি সত্যি-মিথ্যে বুঝি না? তুমি তো বুঝিয়ে দিলে, তোমার মত নেই!

—আমি মোটেই সে রকম কিছু বলিনি। তুই একা একা অতদূরে যাবি, আমার একটু ভয় করবে না? চিন্তা হবে না?

—একা থাকতে তোমার অসুবিধে হবে, সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল !

—আমার অসুবিধের কথা বলিনি। আমি একা থাকতে পারবো না কেন? আমি তোর কথাই ভেবেছি। তুই তো কখনো একা কোথাও যাসনি, থাকিসনি।

—আগে যা করিনি, সে রকম অনেক কিছুই তো এখন করি। আগে কি কখনো রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরতাম? এয়ারপোর্টে গিয়ে অর্থমন্ত্রীর ইন্টারভিউ নিয়েছি আগে? এর আগে······

—যাক, বুঝেছি। তুই অমনি সুব্রতকে দৌড়ে টেলিফোন করতে গেলি? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলি না? কাল সকালে বলে দিস্—

—আর ফেরানো যাবে না, মা। অফিসের ব্যাপার নিয়ে ছেলেমানুষী চলে না। আমি যাবো না বলে দিয়েছি।

খাওয়া বন্ধ করে সীমা অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো মেয়ের দিকে।

॥ ২ ॥

ঘুম আসছিল-না সীমার। মাথার মধ্যে একটা অস্বস্তিবোধ উইঢিপির মতন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এতগুলো বছর তার জীবনটা শুধু যেন মিলিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল, সেই বৃত্তটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে, এ জন্য সীমার আগেই কি মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল না? আগে সে মিলিকে কখনো বকুনি দিত, চোখ রাঙাতো, আবার আদর করতো, বুকে জড়িয়ে ধরতো। কিন্তু মা আর সন্তানের মধ্যেও এই সম্পর্ক যে চিরকাল চলতে পারে না, তা কি সে জানতো না?

নিজের মায়ের প্রচণ্ড অমতে বিনায়ককে বিয়ে করেছিল সীমা।

মা খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু সীমা কি তা গ্রাহ্য করেছিল ? বরং সে ভেবেছিল, মা ভুল করছেন, মা যুক্তিহীনভাবে বিনায়ককে স্বীকার করতে চাইছেন না, সেজন্য মায়ের ওপর তার রাগ হয়েছিল। সে দূরে সরে গিয়েছিল। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে সে একবারও বাপের বাড়ি যায়নি।

তন্দ্রার মতন এসেছিল, সীমা স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছিল নিজের মায়ের সঙ্গে। মা অনেক দিন নেই। কিছু একটা আওয়াজে চট্‌কা ঘুম ভেঙে গেল। মিলির ঘরের দরজা খুললো। রাত্তিরে মিলি একবার বাথরুমে যায়।

আজ মিলির একটা কথা সীমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে।

মিলি ভেবেছে যে সীমা একা থাকতে পারবে না বলেই মেয়েকে হায়দ্রাবাদ পাঠাতে আপত্তি জানিয়েছে।

মিলিকে কি সে সারাজীবন নিজের কাছে ধরে রাখবে নাকি ? সে কি এত স্বার্থপর ? বিয়ের পর মিলি চলে যাবে, সে জন্য নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে নিশ্চয়ই। শংকর ছেলেটিকে সীমার ভালোই লাগে।

গত দশ-পনেরো বছর ধরে কিছু কিছু ব্যাপার বেশ বদলে গেছে। ছেলেমেয়েরা অনেক খোলামেলাভাবে মেলামেশা করে। আগের মতো বাড়িতে লুকোচুরি করতে হয় না। মেয়েরা অনেক স্বাবলম্বী হয়েছে। মেয়েরা অনেক দূরে দূরে চাকরি করতে যায়। বিপুল-মায়াদের মেয়ে কেয়া বিয়ে করলো প্রিয়ব্রতকে, এই তো মাত্র দু'বছর আগে, দু'জনেই ব্যাংকের চাকরি করে। এর মধ্যে কেয়া ট্রান্সফার হয়ে গেল বিষ্ণুপুরে। কেয়া চাকরি ছাড়লো না। বিষ্ণুপুরে সে ঘর ভাড়া করে থাকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জায়গায়। আগে স্বামীরা চাকরির সূত্রে বিদেশে চলে যেত, এখন প্রিয়ব্রতর মতন স্বামীরা কলকাতায় থাকে, আর কেয়ার মতন স্ত্রীরা বিনা দ্বিধায় দূরে চলে যায়।

আগে মেয়েরা স্কুল বা কলেজের চাকরি পেলেই খুশী হতো, এখন কেউ কেউ সাংবাদিক হচ্ছে, ওদের তো যখন তখন বাইরে যেতে হতে পারেই। মিলি কাজ করছে একটা ইংরিজি সাপ্তাহিকে, ওদেব অফিস থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ বম্বে-দিল্লী যায়। মিলিকেও যেতে হবে, এটা তো স্বাভাবিক। যুক্তি দিয়ে সবই বোঝে সীমা, তবু একটু আশঙ্কাও থেকে যায়।

মিলি এখনো বাথরুম থেকে ফিরছে না কেন? অনেকক্ষণ সময় লাগছে।

সীমা ধড়মড করে নেমে এলো বিছানা থেকে। আলো না জেবলেই বাইরে যেতে গিয়ে ধাক্কা খেল দরজায়। বাথরুমও অন্ধকার। মিলির ঘরে আলো জবলছে, কিন্তু সেখানে মিলি নেই।

বারান্দায় ছায়াটা দেখতে পেল সীমা। রেলিং-এর ওপর অনেকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে মিলি। সামনের রাস্তা একেবারে শুনশান। শহরের কোনো রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা দেখলে অন্যরকম লাগে। দূরের পথ দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল অনেক শব্দ করে। সেই শব্দের রেশ রয়ে গেল কিছুক্ষণ।

মিলির পাশে এসে দাঁড়ালো সীমা। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, ঘুম আসছে না?

মিলি বললো, না।

—জল খেয়েছিস?

—হ্যাঁ। এক বোতল জল খেলাম। খুব তেষ্টা পাচ্ছিল।

—চিংড়িমাছ খেয়েছিলি, নিশ্চয়ই অম্বল হয়েছে। জোয়ানের আরক দিচ্ছি, খেয়ে নে!

—তাও খেয়ে নিয়েছি।

—সত্যি খেয়েছিস, না আমি এনে দেবো?

—সত্যি খেয়েছি। তুমি উঠে এলে কেন?

—তুই আমার পাশে এসে শুবি ? মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো, ঘুম আসবে।

—এখানে দাঁড়াতে ভালো লাগছে। পাখার হাওয়ার চেয়েও এখানকার হাওয়া অনেক ভালো।

—মিলি, তুই কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেলে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

মিলি এবার মুখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর মুচকি হেসে বললো, তুমি একা থাকতে পারবে? তোমার ভুতের ভয় করবে না ?

সীমাও হেসে বললো, ধ্যাৎ, কী যে বলিস!

—তুমি তো কখনো একা থাকোনি !

—এখন থেকে অভ্যেস করবো। হ্যাঁরে, মিলি, শংকর তোকে কিছু বলেনি ?

—কী বলবে ?

—মানে, তোরা কিছু ঠিক করিসনি ?

—তুমি বিয়ের কথা বলছো? না, সে রকম কিছু ঠিক করিনি তো !

—কিছু ঠিক করিসনি ? কেন ? শঙ্করকে একদিন বাড়িতে ডাক না।

—ডাকতে পারি। ও খুব লোভী, তুমি ওকে রান্না করে পেট ভরিয়ে খাওয়াবে। কিন্তু ডাকবো একটা শর্তে তুমি ওর সামনে বিয়ের প্রসঙ্গ একদম তুলতে পারবে না।

—তুই পাগল নাকি, আমি সেসব কথা কেন বলবো! তুই হায়দ্রাবাদ থেকে ঘুরে আয় তারপর শংকরকে একদিন নেমন্তন্ন কর বাড়িতে ।

—চলো, মা, আজ তোমার পাশে গিয়ে শোবো! তুমি আমায় একটা গান শোনাবে। আগে যেমন গুনগুন করে গাইতে।

অনেকদিন শুনিনি।

সীমার হঠাৎ খুশীতে মন ভরে গেল। মিলিও যেন বালিকা হয়ে গেল হঠাৎ। বিনায়ক চলে যাবার পর অনেক দিন মা আর মেয়ে এক বিছানায় শুয়েছে। সীমার গানের গলা ভালো। বিয়ের আগে সে দু'একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানেও গান গেয়েছে। মিলি জন্মাবার পর আর চর্চা রাখেনি।

মিলি কিন্তু একটা গানও পুরো শুনতে পেল না, তার আগেই ঘুমিয়ে পড়লো। বাচ্চা মেয়ের মতন গুটিশুটি মেরে রইলো সীমার বুকের কাছে। সীমা তাকে জড়িয়ে ধরে জেগে রইলো অনেকক্ষণ।

সকালবেলা মা আর মেয়েতে প্রায় দেখাই হয় না। সীমার মর্নিং স্কুল, বেরুতে হয় পৌনে ছ'টার সময়। মিলি অনেকক্ষণ দেরী করে ঘুমোয়। সীমা চা খেয়ে বেরিয়ে যায়, মিলি টেরও পায় না। সীমা ফিরে আসতে আসতে অফিসে চলে যায় মিলি।

মিলির জন্য একটা ফ্লাসকে চা রেখে সীমা বেরিয়ে পড়লো। স্কুলটা হাঁটাপথ নয়, আবার ট্রামের জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও বিরক্ত লাগে। আজ একটা রিকশা নিয়ে ফেললো সীমা। স্কুলে পৌঁছেই, কিন্তু তার আফশোস হলো। স্কুল কমিটির একজন মেম্বার মারা গেছেন আগের রাতে, আজ তাই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। দু'চারজন টিচার টেলিফোনে খবর পেয়ে আসেইনি। সীমার নিজস্ব ফোন নেই।

বেশ কাছেই সেই মৃত মেম্বারের বাড়ি, দল বেঁধে একবার যেতে হলো সেখানে। তারপর সীমা বাড়ি ফিরে এলো সাড়ে আটটার মধ্যে। তার মনটা খুশী খুশী লাগছে। মিলি রোজ অফিস ক্যান্টিনে খায়, আজ সীমা তার জন্য ভাত রেঁধে দেবে। কাল মেয়েটাকে খুব বকুনি দেওয়া হয়েছে।

দরজা খোলার পর দেখলো খাবার টেবিলে বসে আছে একজন যুবক। বেশ লম্বা, ছ' ফুটের বেশি তো হবেই, মাথাভর্তি চুল, নাকটা খাঁড়ার মতন। সারা বাড়িতে সিগারেটের গন্ধ। টেবিলের ওপর চায়ের পট।

মিলি বললো, মা, তুমি ফিরে এলে যে ?

আসল কারণটা না জানিয়ে সীমা বললো, আজ ক্লাস নিতে ভালো লাগলো না।

মিলি বললো, বেশ করেছো। রোজই যে ইস্কুলে যেতে হবে, তার কী মানে আছে ? এই হচ্ছে হীরেন, তুমি একে আগে দেখোনি বোধহয়। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। সকাল-বেলাতেই কেন ছুটে এসেছে বলো তো ?

বাড়িতে একজন অচেনা যুবককে দেখতে পাবে, সীমা একেবারে আশাই করেনি। ছেলেটি দিব্যি জমিয়ে বসেছে। প্রায়ই এসময় আসে নাকি ? এরকমভাবে সকালবেলা কেউ মিলির কাছে এলে বাড়ির অন্য লোকরা কী ভাববে ?

সীমা কৌতূহলের চোখে ছেলেটির দিকে তাকাতেই সে বেশ সাবলীলভাবে বলে উঠলো, নমস্কার, মাসিমা, ফিরে এসেছেন ভালো করেছেন। মিলি কী সব পাগলামি করছে বলুন তো ! আপনি একটু বকে দিন।

সীমা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ?

হীরেন বললো, মিলি হায়দ্রাবাদ যাবে না ? আমার সাধারণত ন'টার আগে ঘুম ভাঙে না, আজ সুব্রতদা সকাল সাতটা থেকে তিনবার টেলিফোন করেছে। মিলিকে যা বকলো, সে আপনি ভাবতে পারবেন না। মিলি যাবে সব ঠিকঠাক, ওর নামে অ্যাক্রেডিশান কার্ড হয়ে গেছে।

মিলি বাধা দিয়ে বললো, মোটেই সব ঠিকঠাক ছিল না। আমি বলেছি, মাকে জিজ্ঞেস করে, তারপর জানাবো।

হীরেন খানিকটা ধমক দিয়ে, খানিকটা ভেংচে বললো, বাজে কথা বলিস না। কচি খুকি নাকি, মা-কে জিজ্ঞেস করে তারপর জানাবো! মাসিমা মোটেই আপত্তি করবেন না। তুই ভয় পাচ্ছিস, তাই বল! মাসিমা, আপনার কোনো আপত্তি আছে, বলুন?

সীমা বিহ্বলভাবে দু'দিকে ঘাড় নাড়লো।

হীরেন আবার বললো, বাইরে যেতে ভয় পেলে কখনো জার্নালিস্ট হওয়া যায়? এ কাজে এটাই তো আসল চার্ম। বুঝলেন মাসিমা, বাইরে ঘুরলে অভিজ্ঞতা তো হয়, কিছু এক্সট্রা টাকাও হয়। কম্পানি যা দেবে, তার থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে শপিং-টপিং করা যায়। অন্য কেউ এই চান্স পেলে লুফে নেবে, আর তুই ভয় পাচ্ছিস, মিলি?

মিলি বললো, আমি মোটেই ভয় পাইনি।

হীরেন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে মাসিমা, ওর ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে দিন। গরম জামা দিয়ে দেবেন, ওদিকে সন্ধ্যের পর একটু একটু ঠাণ্ডা হয়। কোনো চিন্তা করবেন না, আমি তো সঙ্গে থাকবো!

হীরেনকে এগিয়ে দিতে মিলি সিঁড়ি পর্যন্ত গেল।

মিলির হায়দ্রাবাদ যাওয়া নিয়ে সীমার মনে আর কোনো সংশয়ই নেই। কিন্তু একটা কথা সে বুঝতে পারছে না, হীরেনের সঙ্গে মিলির এত ভাব যে ওরা তুই তুই বলে কথা বলে। এই হীরেনের সঙ্গে হায়দ্রাবাদে গিয়ে মিলি এক হোটেলে থাকবে। শংকরের তাতে কিছু মনে হবে না?

মিলি ফিরে আসবার পর সীমা বললো, শোন, একটা কথা মনে পড়েছে। হায়দ্রাবাদে তো ডাবুলদা থাকে। তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই তো হয়। তুই ডাবুলদার বাড়িতে থাকতে পারবি, হোটেলে থাকতে যাবি কেন?

মিলি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ডাব্‌লদা মানে ?

—তোর ডাব্‌লমামা। অসিতরঞ্জন রায়, আমার নিজের খুড়তুতো দাদা। খুব বড় চাকরি করেন। তোর মনে নেই একবার আমার জন্য একটা কাঞ্জীভরম শাড়ি এনেছিল। তোকে খুব ভালোবাসে।

—তার বাড়িতে আমি থাকতে যাবো কেন ?

—নিজের আত্মীয় থাকতে কেউ হোটেলে ওঠে ? ডাব্‌লদা, পিকুবৌদি তোকে দেখলে খুব খুশী হবে।

—দ্যাখো মা, অফিসের কাজে গিয়ে আত্মীয়-টাত্মীয়র বাড়িতে থাকা যায় না। ওঁদের সঙ্গে অনেক দিন যোগাযোগ নেই, শুধু হোটেলের টাকা বাঁচাবার জন্য ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠবো, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

এবারও মেয়ের কাছে হেরে গেল সীমা। মিলির যুক্তি অকাট্য।

সীমা অনেক দিন কলকাতার বাইরে যায়নি। তাই তার ধারণা, হায়দ্রাবাদের মতন অত দূরের একটা জায়গায় যেতে হলে অনেক ব্যবস্থাপনার দরকার। সে সব কিছুই না। পরদিন মিলি একটা মাঝারি আকারের ব্যাগে কয়েকটা মাত্র পোশাক ভরে নিল, সেই ব্যাগটা নিয়েই অফিসে গেল। ওখান থেকেই সন্ধ্যেবেলা এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরবে। যাবার সময় মায়ের গাল টিপে মিলি বলে গেল, সাবধানে থাকবে।

বিকেল থেকেই ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে সীমা। ছ'টা চল্লিশ বাজতেই তার মনে হলো, মিলির প্লেন ছাড়লো এইমাত্র। আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মিলি। চলে গেল অনেক দূরে।

অন্যদিনও মিলি এসময় বাড়িতে ফেরে না, কিন্তু আজ এরই মধ্যে মনে হচ্ছে বাড়িটা অসম্ভব ফাঁকা। রাত্তিরে মিলি ফিরবে না। মাত্র পৌনে সাতটা বাজে, ঘুমোবার আগে এখনো কত সময়

পড়ে আছে।

মিলির ঘরে ঢুকে সীমা জিনিসপত্র গুছোতে বসলো। মিলি সবকিছু এলোমেলো করে রাখে। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো। খাটের তলায় বই। মিলির একটা ব্লাউজ অনেক দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটা রয়েছে একটা মোটা খাতার মধ্যে। আচ্ছা, খাতার মধ্যে কেউ ব্লাউজ রাখে? অনেক দিন আগেকার একটা চকলেটের বাক্স রয়েছে জামা-কাপড়ের আলমারিতে, চকলেট-গুলো গলে চটচটে হয়ে আছে।

আলমারির মধ্যে একজোড়া স্কার্ট-ব্লাউজ রয়েছে, এগুলো এলো কোথা থেকে? মিলি তো এসব পরে না। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে সীমার মনে পড়লো, হ্যাঁ, এগুলো মিলিরই তো, প্রথম প্রথম কলেজে যাওয়ার সময় পরতো। স্কার্ট পরলে মিলিকে খুব বাচ্চা দেখায়, কলেজে দু'তিনটি ছেলে ওকে খুকী খুকী বলে আওয়াজ দিয়েছিল বলে তারপর থেকে মিলি আর এগুলো পরেনি।

এই স্কার্ট-ব্লাউজ বিনায়ক কিনে দিয়েছিল। বাবার সঙ্গে মেয়ের ভাব ছিল বেশি। কোনো নতুন বই পড়লেই বিনায়ক মেয়েকে ডেকে গল্পটা শোনাতো। বিনায়কের শখ ছিল, তার মেয়ে ব্যারিস্টার হবে। মিলির গ্রাজুয়েশানও সে দেখে যেতে পারলো না। মিলি বরাবরই ইংরিজি ভালো লেখে। ব্যারিস্টারির দিকে তার কোনো আগ্রহই নেই, সে নিজেই ইংরিজি সাংবাদিকতার কাজ বেছে নিয়েছে।

মাত্র চার-পাঁচ দিনের জন্য গেছে মিলি, কিন্তু কেন মনে হচ্ছে সে আর ফিরবে না?

এসব যুক্তিহীন চিন্তা। কেন ফিরবে না, নিশ্চয়ই ফিরবে। হ্যাঁ, কলকাতায় ফিরবে, কিন্তু সে কি তার মায়ের কাছে কোনোদিন ফিরে আসবে?

দরজায় কেউ বেল দিল। এই সময় একজন লোক ইস্ত্রি করার জন্য শাড়ি-জামা নিতে আসে। আজ সারা দুপুর অনেক কাচাকাচি করেছে সীমা।

দরজা খুলে দেখলো দোতলার বিপুল আর তার সঙ্গে আর একজন ব্যক্তি। বিপুলকে দেখে হাসতে গিয়েও পাশের লোকটির দিকে চোখ ফেলে গম্ভীর হয়ে গেল সীমা।

বিপুল বললো, কী করছিলে? দু'তিনবার বেল বাজালুম, সাড়া নেই। দ্যাখো, প্রদীপকে নিয়ে এসেছি। প্রদীপকে মনে আছে তো?

মাঝারি উচ্চতা, ঈষৎ স্থূলকার প্রদীপ বললো, নিশ্চয়ই ওর মনে আছে। আমাকে কেউ সহজে ভুলতে পারে না।

সীমা এবার বললো, কেমন আছেন? কবে এলেন?

প্রদীপ বললো, এই তো এলাম, কবে যেন, শনিবার না রবিবার! তুমি তো একই রকম আছো, সীমা। তোমার চেহারা একটুও বদলায়নি।

বিপুল বললো, সেটা ঠিক, সীমা এত স্ট্রাগল করেছে। কিন্তু ওর চেহারায় তার কোনো ছাপ পড়েনি।

আলাদা কোনো বসবার জায়গা নেই, খাবার টেবিলেই এসে সবাই বসে।

প্রদীপ এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, কী যেন একটা বদল হয়েছে। আগে এই জায়গাটা অন্য রকম ছিল।

বিপুল এ পরিবারের অভিভাবকের মতন। সে বললো, তোর ঠিক মনে আছে তো! রান্নাঘরের দিকটায় একটা দেওয়াল তোলা হয়েছে নইলে বড্ড ধোঁয়া আসতো এদিকে। আগের টেবিলটাও ছিল চৌকো ধরনের, তাই না সীমা?

প্রদীপ বললো, হ্যাঁ, আগে রান্নাঘরের দিকের ঐ পার্টিশানটা ছিল না, এখানে বসে বসেই রান্নাঘরটা দেখা যেত। আমি বোধ

হয় ঠিক সাত বছর পরে এলাম!

সীমা জিজ্ঞেস করলো, চা করি?

বিপুল বললো, তা তো করবেই, মায়া একটা থিয়েটারে গেছে। কাজের মেয়েটাও নেই। প্রদীপকে চা খাওয়াবার জন্যই তো তোমার এখানে এলাম।

প্রদীপ বললো, শুধু সে জন্য নয়, সীমাকে দেখতেও এসেছি। তোমার মেয়ে কোথায়?

বিপুল বললো, মিলি তো এখন চাকরি করছে। অনেক বড় হয়ে গেছে। একটা ইংরিজি সাপ্তাহিক পত্রিকার রিপোর্টার। ওর অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরি হয়।

সীমা বললো, মিলি আজ ফিরবে না। অফিসের কাজে ও আজই হায়দ্রাবাদ গেল।

বিপুল অবাক চোখে তাকালো। খানিকটা ক্ষুণ্ণও হয়েছে সে। মিলি অতদূরে গেছে, একথা মিলি কিংবা সীমা তাকে জানায়নি।

সীমা খানিকটা বুঝতে পেরে বললো, অফিস থেকে তাড়াহুড়ো করে পাঠালো। আমি একটু আপত্তি করেছিলাম, বলেছিলাম, এ সপ্তাহে না গিয়ে পরের সপ্তাহে যা—

প্রদীপ হেসে বললো, পত্র-পত্রিকার কাজে কি এ সপ্তাহের বদলে পরের সপ্তাহে গেলে চলে? ততদিনে খবর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বিপুল বললো, মিলি ক'দিন বাইরে থাকবে?

সীমা বললো, বেশি না, চার-পাঁচ দিন। প্লেনে গেছে।

বিপুল বললো, তুমি একা থাকবে? কখনো তো থাকোনি। নীচে আমাদের ওখানে গিয়ে মায়ার সঙ্গে শুতে পারো।

সীমা বললো, আমাকে কী ভাবেন বলুন তো! ছেলেমানুষ নাকি? বুড়ি হয়ে গেলাম, একা থাকতে ভয় কী!

প্রদীপ বললো, বুড়িরাই একা থাকতে ভয় পায়। তুমি বুড়ি হওনি, তুমি ভয় পাবে না। মাঝে মাঝে দু'চার দিন একা থাকতে তো ভালই লাগে। এই ক'দিন দেখবে, তোমার একটু অন্যরকম লাগবে। অন্য সময় তুমি মিলির মা। তোমার নিজের কাছেও সেটাই তোমার পরিচয়। একা থাকার সময় তুমি টের পাবে যে, তুমি সীমা, তোমার আলাদা একটা পরিচয়ও আছে।

বিপুল বললো, আজ এখনো রান্নাবান্না করোনি তো! শুধু নিজের জন্য কী রান্না করবে!

প্রদীপ বললো, এর মধ্যে তা হলে সীমা আমাদের একদিন রান্না করে খাওয়াক।

বিপুল বললো, শুধু শুধু ওকে ঝামেলায় ফেলবি কেন? সীমাই বরং আমাদের সঙ্গে গিয়ে খাবে।

প্রদীপ বললো, বাঃ, বিনায়কের বউ একদিন আমাদের রান্না করে খাওয়াবে না? আমরা না হয় বাজার-টাজার করে দেবো।

সীমা বললো, আপনাদের বাজার করতে হবে না। আমি একদিন খাওয়াবো। কবে আসবেন বলুন।

বিপুল বললো, সে পরে ঠিক করা যাবে। প্রদীপ তো আছে চার পাঁচ দিন। সীমা, তুমি এখন আমাদের ওখানে চলো। একসঙ্গে আড্ডা দেবো, তারপর আমাদের সঙ্গে খেয়ে নেবে। প্রদীপের কাছে তেহেরানের অনেক মজার মজার গল্প শুনতে পাবে।

সীমা তিনটে কাপে চা ঢাললো। বিনায়কের দুই বন্ধু এসে পড়ায় তার শূন্যতাবোধটা অনেকটা কেটে গেছে। এরপর বিপুলদের ফ্ল্যাটে গিয়ে গল্প করতে তার খারাপ লাগবে না।

প্রদীপ জিজ্ঞেস করলো, মায়া থিয়েটার দেখতে গেছে, তুমি যাওনি কেন, সীমা?

বিপুল বললো, সীমা তো বাড়ি থেকে বেরুতেই চায় না।

মায়া কতবার বলেছে। সীমা সেই সকালবেলা একবার ইস্কুলে যায়। তারপর তো দেখি সারা সন্ধ্যে মেয়ের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে।

প্রদীপ একটু ঠাট্টার সুরে বললো, একেবারে মেয়ে-অন্ত প্রাণ! কিন্তু মেয়ে তো এখন বড় হয়ে গেছে।

বিপুল বললো, সীমা একার চেষ্টায় মেয়েটাকে তো মানুষ করে তুলেছে। খুব ভালো হয়েছে মিলি। সীমার খুব মনের জোর।

প্রদীপ বললো, তুমি সিনেমা-থিয়েটার কিছু দেখো না বুঝি?

সীমা বললো, দেখবো না কেন? মিলিই তো প্রায়ই টিকিট কেটে আনে।

দরজায় আবার ঠকঠক হলো। শাড়ি-জামার ইস্তিরির লোকটা এসেছে। দোতলা থেকে আর একটা বাচ্চা মেয়েও এসেছে। সে জানালো যে বিপুলকে টেলিফোনে কেউ ডাকছে।

বিপুল তাড়াতাড়ি চা শেষ করে বললো, প্রদীপ, তুই চা খেয়ে নে। সীমাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে চলে আয়।

বিপুল চলে যাবার পর সীমা ইস্তিরিওয়ালাকে কাপড়-জামা বুঝিয়ে দিল। ইচ্ছে করে সে দেরি করলো খানিকটা। প্রদীপ চুপ করে বসে আছে। সীমা ঘর থেকে বেরুচ্ছে, দরজার কাছে যাচ্ছে, তাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে সে।

এক সময় দরজা বন্ধ করে টেবিলের কাছে ফিরে আসতেই হলো সীমাকে। প্রদীপ তার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

প্রায় মিনিট দু'এক কোনো কথা বললো না দু'জনে।

তারপর প্রদীপ জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, সীমা?

সীমা বললো, ভালো!

প্রদীপ একটু হেসে বললো, আমার ওপরে এখনো রাগ আছে?

সীমা উদাসীন গলায় বললো, না !

আরও একটুক্ষণ চুপ করে রইলো প্রদীপ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলো। তাতে খসখস করে কিছু লিখে বললো, আমি তাজ হোটেলে উঠেছি। এই আমার রুম নাম্বার। তুমি ইচ্ছে করলে একবার আসতে পারো। এই গরমে আমি দুপুরের দিকটায় বেরোই না। তুমি এলে কিছু কথা বলতে পারি। এখানে আর বসবো না। আর কেউ নেই, শুধু আমার সামনে বসতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে বুঝতে পারছি। হোটেলের ঘরেও অবশ্য আর কেউ থাকবে না। কিন্তু সেখানে তুমি গেলে বুঝবো, তুমি নিজের ইচ্ছেতে এসেছো। আসতে পারো; অন্য কোনো ভয় নেই।

কাগজটা নেবার জন্য হাত বড়োলো না সীমা। কোনো কথা বললো না। মুখ নীচু করে রইলো।

প্রদীপ কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে বললো ইচ্ছে হয় তো এসো। হোটেলে যদি আসতে না চাও, অন্য কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। কিন্তু এখানে নয়।

সীমা তবু কোনো উত্তর দিল না দেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল প্রদীপ।

॥ ৩ ॥

মিলি একেবারে ঠিক দিনে পেঁছোলো হায়দ্রাবাদে। পরদিনই অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পতন হয়ে গেল দিল্লির নির্দেশে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার মিলির আগে কলকাতার আর কোনো কাগজ পায়নি। মিলি এর আগে আর কোনো পলিটিক্যাল স্টোরি করেনি, সবাই তার লেখাটা পড়লো, তার নাম জানলো।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কী ভাবে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নিতে হয়, সে সব

ব্যাপারে কোনো যোগ্যতা ছিল না মিলির। হীরেন তাকে সাহায্য করলো খুব। হীরেন অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার।

হোটেলে পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়েছে ওরা। পরের দিন খবর-টবর সব পাঠিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হলো অনেক। হোটেলে এখন আর খাবার পাওয়া যাবে না। দু'জনেরই খিদে পেয়েছে সাংঘাতিক। খাবার পাওয়া যাবে না শুনে খিদে আরও বেড়ে গেল।

হীরেন বললো, হায়দ্রাবাদ শহরে কাবাব-টাবাবের অনেক দোকান খোলা থাকে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত। বেরিয়ে খাবার যোগাড় করবো। তুই স্নান-টান করবি তো করে নে, ততক্ষণে আমিও একটু তৈরি হয়ে নি।

হীরেনের তৈরি হওয়া মানে বোতল খোলা! কাজের সময় সে খুবই মনস্ক, কিন্তু তারপরে তার বেশ খানিকটা মদ গেলা চাই।

মিলি স্নান সেরে, পোষাক বদল করে হীরেনের ঘরে এসে বললো, এই যাবি না?

হীরেন বললো, খুব খিদে লেগেছে। চীজ খা। বাদাম খা। একটুখানি বোস।

আর একটা গেলাশ নিয়ে হীরেন বললো, তুই জল, না সোডা দিয়ে খাবি।

মিলি বললো, আমি হুইস্কি খাই না। রাম থাকলে একটু খেতে পারতাম।

মিলির কথা গ্রাহ্য করলো না হীরেন। দ্বিতীয় গেলাশে খানিকটা হুইস্কি ঢাললো। তারপর বললো, বাইরে এলে সব সময় খানিকটা চীজ, বাদাম, বিস্কিট এসব সঙ্গে রাখবি। কখন কী পাওয়া যাবে তার তো কোনো ঠিক নেই। জার্নালিস্টদের কি কখনো সময়ের ঠিক থাকে! এই নে!

মিলি বললো, বললাম যে আমি হুইস্কি খাই না। তোর কাছে রাম তো নেই!

হীরেন ধমক দিয়ে বললো, ধর, রাম আর হুইস্কির কী তফাৎ রে? এসব দিশী জিনিস সবই এক। নেশা করা নিয়ে ব্যাপার।

—তোর মতন আমি নেশা করতে চাই না।

—আমাকে কম্পানি দে। ধর গেলাশটা!

—বলছি তো খাবো না!

—জেদী মেয়ে। ঠিক আছে, খেতে হবে না। চুপ করে বসে থাক। আমি আরও দুটো খেয়ে বেরুবো।

—আরও দুটো খাবি? অত রাত্তিরে আমি আর বেরুতে চাই না। তা হলে আমি শুতে যাচ্ছি!

—দুটো খেতে কতক্ষণ সময় লাগে তোর ধারণা! দেখবি?

পরপর দু'চুমুকে হীরেন দু'পেগ হুইস্কি শেষ করলো। ক্যামেরার ব্যাগটা চাপিয়ে বললো, চল।

—এগুলো নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

—এই দামি ক্যামেরা আমি হোটেলে রেখে যাবো? তোর মাথা খারাপ? টাকা-পয়সা কিছু রেখে যাচ্ছিস না তো? সব সময় সঙ্গে রাখবি!

এত দ্রুত হুইস্কি পান করেও হীরেনের পা টলে না। মাথা পরিষ্কার। হোটেলের নীচের এসে সে একটা ফটফটিয়া ভাড়া করলো। তার চালককে বোঝালো যে, এখন দু'ঘণ্টা ঘুরতে হবে, আবার তাদের হোটেলে ফিরিয়ে দেবার পরে ভাড়া পাবে।

প্রথম দু'তিনটে দোকান দেখে হীরেনের পছন্দ হলো না। তারপর একটা দোকান পাওয়া গেল, রাত বারোটার সময়ও সেটা বেশ জমজমাট। বাইরের দিকে দুটো উনুনে কাবাব-পরোটা তৈরি হচ্ছে। ভেতরে অনেক খদ্দের, রাস্তার ওপর বেঞ্চ পেতেও

বসেছে কয়েকজন।

হীরেন বললো, বাঃ, এইটাই তো চমৎকার।

বাইরের বেঞ্চেই বসলো দু'জনে। নিজেদের জন্য এবং ফট-ফটিয়া চালকের জন্যও কাবাব-পরোটা অর্ডার দিল হীরেন। তারপর তাকিয়ে দেখলো, অন্যান্য খদ্দেরদের হাতে গেলাশ।

একজন বাচ্চা মতন বেয়ারাকে ডেকে চুপি চুপি সে জিজ্ঞেস করলো, ওরা কী খাচ্ছে ?

ছেলেটি বলল, রাম !

হীরেন খুশী হয়ে বললো, দো পেগ লাগাও।

ছেলেটি জল মিশিয়ে দু গেলাশ রাম নিয়ে আসতেই মিলি বললো, পাগল নাকি ? আমি খাবো না।

হীরেন বললো, এই যে তখন বললি, হুইস্কির বদলে রাম খাবি ?

মিলি বললো, তখন বলেছিলাম, কিন্তু এখানে বসে খাবো নাকি ?

হীরেন বললো, আরে তাতে কী হয়েছে ? জার্নালিস্ট হয়েছিস, অত জায়গা নিয়ে বাছ-বিচার করলে চলে ? নে, ধর, ধর।

গেলাশটা নিতেই হলো মিলিকে। হীরেন সিগারেট জ্বেলে প্যাকেটটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই মিলি চাপা ধমক দিয়ে বললো, এখানে কিছুতেই সিগারেট খাবো না।

অন্য খদ্দেরদের মধ্যে আর একটিও মেয়ে নেই। কয়েকজন ত্যারছা চোখে মিলিকে দেখছে।

গেলাশটাতে একটা চুমুক দিয়েই মিলির হাসি পেয়ে গেল। তার মা যদি কোনোক্রমে জানতে পারে যে মিলি রাত বারোটার সময় একটা অচেনা শহরে, রাস্তার ধারের দোকানে কতকগুলো গুণ্ডামতন লোকের মাঝখানে বসে মদ খাচ্ছে, তাহলে মা একেবারে

অজ্ঞান হয়ে যাবে !

একটা গেলাশই মিলি হাতে নিয়ে বসে রইলো। সে কিছুতেই এর বেশি খাবে না। মেয়ে হয়েও সে যে কোনো কিছুতেই ভয় পায় না, সেটাই যেন সে হীরেনের কাছে প্রমাণ করতে চায়।

হীরেন দু'বার নিল। তারপর সবেমাত্র একটুখানি পরোটা মাংস খাওয়া হয়েছে এমন সময় খানিক দূরেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফাটলো কয়েকটা। সঙ্গে সঙ্গে মানুষজনের তুমুল চিৎকার।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকালো। কাছেই একটা বাজার, সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। একদল লোক রে-রে করে ছুটে এলো এদিকে। হীরেন আর দেরি করলো না, মিলির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড়ে ঢুকে গেল একটা সরু গলির মধ্যে। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে লাফ মারলো। সেখানে রয়েছে একটা খড়ের গাদা। দু'জনে প্রায় ডুবে গেল তার মধ্যে।

মিলির মুখে হাত চাপ দিয়ে হীরেন বললো, চুপ, কোনো শব্দ নয়। ভয় নেই।

হীরেনের বুকের সঙ্গে লেপ্টে থেকেও মিলি থরথর করে কাঁপছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাইরের চিৎকার-চেঁচামেচি মিলিয়ে গেল একেবারে। হঠাৎ সব চুপ।

হীরেন আগে একা একা উঠে দাঁড়ালো। সামনে গিয়ে খানিকটা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে এসে বললো, অল ক্লিয়ার। উঠে আয়।

মিলির হাত ধরে গলির বাইরে এসে দেখলো কোথাও কোনো মানুষ নেই। দোকানটার ঝাঁপ বন্ধ। বেঞ্চিগুলোও তুলে ফেলেছে। সবাই একেবারে হাওয়া। শুধু দূরের বাজারের কাছে আগুন

জ্বলছে। সেখানে আবার দুটো বোমা ফাটার শব্দ হলো।

হীরেন বললো, শালা, খাওয়াটা হলো না ভালো করে। মুখের গেরাশ কেড়ে নিল!

ফটফটিওয়ালাও পালিয়েছে। গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্নমাত্র নেই।

মিলি ফ্যাকাসে গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমাদের হোটেলটা কোন দিকে? যাবো কী করে?

হীরেন বললো, হোটেলে যাবো মানে? দাঙ্গা লেগে গেছে, বুঝতে পারছিস না? এখন যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

মিলি শিউরে উঠে বললো, দাঙ্গা?

—হ্যাঁ, দাঙ্গা কি রোজ রোজ হয় নাকি? এরকম একটা চান্স পাওয়া গেছে, এটাকে পুরো কভার করতে হবে। তুই তো খুব লাকি রে মিলি। একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিবি।

—আমি দাঙ্গার রিপোর্ট করতে পারবো না। আমি এক্ষুণি হোটেলে ফিরতে চাই।

—তুই ফিরতে চাস, চলে যা। হোটেলে বসেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখা যায়। কিন্তু ছবির বেলায় তো চালাকি চলে না। স্পটে গিয়ে ছবি তুলতে হয়। আমি তো এখন ফিরতে পারবো না।

—আমি একা হোটেলে যাবো কী করে?

—সেটা আমি কী জানি ভাই! তোর কাজ তুই করবি, আমার কাজ আমাকে করতে হবে। এই রকম জায়গাতে থেকেও ছবি না তুলে ফিরলে সুব্রতদা আমায় রক্ষে রাখবে!

বাজারের কাছে গোলমালটা এবং হিংস্রতা ও আর্ত চিৎকারে ভরে গেছে। খুব জোর মারামারি চলছে সেখানে। এখানকার সব বাড়ির জানলা দরজা বন্ধ, কেউ আশ্রয় দেবে না।

হর্ন বাজাতে বাজাতে খুব স্পীডে ছুটে আসছে একটা পুলিশের গাড়ি। হীরেন এক লাফ দিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে

দাঁড়ালো। দারুণ ঝুঁকি নিয়েছিল সে, গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষাতে কর্কশ শব্দ হলো।

হীরেন হাত নেড়ে বললো, মিলি, শীগগির আয়! শীগগির!

এত সব কাণ্ড দেখে মিলির বুক ঢিপঢিপ করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ। সে দৌড়ে এলো গাড়ির কাছে।

হীরেন পুলিশের গাড়িটাতে উঠতে যেতেই একজন পুলিশ রুক্ষভাবে তাকে ঠেলে দিয়ে হিন্দীতে বলল, আপনারা এখানে কি করছেন?

হীরেন তার উত্তর না দিয়ে ব্যস্তভাবে বললো, গাড়িতে উঠতে দিন! উঠতে দিন।

পুলিশটি এবার রিভলবার বার করে ধমক দিয়ে বললো, কে আপনারা? কী চাই?

সেটাও গ্রাহ্য না করে হীরেন বললো, গাড়িতে উঠতে দেবেন না নাকি? আমাদের এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে আপনাদেরও তো দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অন্য একজন পুলিশ গলা বাড়িয়ে বললো, ওদের তুলে নাও। কিন্তু আপনাদের আমরা এখন বাড়ি পেঁছে দিতে পারবো না। এত রাত্রে কি ফুর্তি করতে বেরিয়েছিলেন?

হীরেন বললো, বাড়ি পেঁছে দিতে তো বলিনি! আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই যাবো। এইরকম দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় পুলিশের সঙ্গ কেউ কি ছাড়তে চায়?

পুলিশটি ঠাট্টার সুরে বললো, বটে! আপনার তো সাহস কম নয়! আপনি হঠাৎ গাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আর একটু হলে চাপা পড়তে পারতেন!

হীরেন হো হো করে হেসে উঠে বললো, পাগল নাকি? জার্নালিস্টরা কখনো চাপা পড়ে না। আজ পর্যন্ত কখনো শুনেছেন যে কোনো জার্নালিষ্ট পুলিশের গাড়িতে চাপা পড়েছে?

—আপনারা জার্নালিস্ট ?

—ইয়েস। ইনি আমার কলিগ মিস মিলি সান্যাল। আজই ইনি চীফ মিনিস্টারের ইণ্টারভিউ নিয়েছেন। সরি, এক্স-চীফ মিনিস্টার। কাল সকালে গভর্নরের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

—আজ এই তো এইমাত্র এখানে দাঙ্গা শুরু হলো। এর মধ্যেই আপনারা এখানে হাজির হলেন কী করে ?

—জার্নালিস্টদের সব খবর রাখতে হয়।

মিলি এতক্ষণ বাদে একটু সামলে নিয়ে বললো, আমরা এখানে কাবাব খেতে এসেছিলাম। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল।

—এই জায়গাটা রাত্তিরে এমনিতেই খুব নিরাপদ নয়।

—দোকানের লোকেরা আমাদের সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করছিল।

এবার গাড়িটার একেবারে সামনেই পরপর দুটো বোমা পড়লো। গাড়িটা থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে, পুলিশরা সবাই নেমে পড়লো লাফিয়ে। একেবারে বিনা নোটিশে গুলি চালিয়ে দিল একজন।

হীরেন বললো, নেমে পড়, নেমে পড় !

দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে মিলি হীরেনকে জড়িয়ে ধরেছে। এর আগে কখনো সে এত কাছ থেকে গুলির আওয়াজ শোনেনি, এমনভাবে বোমা পড়তেও দেখেনি। হীরেনের কথায় সে কোনো সাড়া দিল না।

হীরেন খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, পুলিশগুলো তো সব কেটে পড়লো, এবার ব্যাটারা গাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দেবে। সাধারণত তাই দেয়।

মিলি আরও জোরে জড়িয়ে ধরলো হীরেনকে।

হীরেন সেই আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিতে নিতে হেসে বললো, গাড়ি পোড়ালেও অবশ্য সাংবাদিকরা পোড়ে না। সাংবাদিকরা অমর।

উঠে দাঁড়িয়ে সে ক্যামেরাটা বাগালো।

সামনের রাস্তায় লাঠিসোটা ও লোহার রড-ধরা বেশ কিছু লোককে তাড়া করে যাচ্ছে পুলিশ। কাছেই দাউ দাউ করে জ্বলছে কয়েকটি দোকান। গাড়ির ওপর থেকে ছবি তোলার বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না বলে হীরেন আস্তে আস্তে নেমে গেল গাড়ি থেকে। আড়াল দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে সে ফিসফিস করে বললো, মিলি, আমার পেছন পেছন আয়! কোনো ভয় নেই।

খুব শোরগোল তুলে এসে পড়লো আরও দুটি পুলিশের গাড়ি আর দমকল।

হীরেন বললো, এবার থেমে যাবে। এত পুলিশের সঙ্গে লড়াই করার ধক ওদের নেই।

দাঙ্গাকারীরা সত্যি এবার পালাচ্ছে। পুলিশ তবু গুলি চালালো পাঁচবার। সম্ভবত আকাশের দিকে।

এরপর আর মিলির দিকে একদম মনোযোগ না দিয়ে সামনে ছুটে গেল হীরেন। শুধু কর্তব্যের টানই নয়, ছবি তোলা তার নেশা। আগুনে পোড়া দোকান, আহত মানুষের একবারে ক্লোজ আপ তুলে আনলো সে।

একটা পুলিশের গাড়িই ওদের পেঁছে দিয়ে গেল হোটেলে।

নিজের ঘরের চাবি খুলতে খুলতে হীরেন বললো, শালা নেশাফেশা ছুটে গেল একেবারে। পেটও ভরলো না। আয় মিলি আমার ঘরে একটু বসে যা। এখন শুয়ে পড়লেও তোর ঘুম আসবে না।

মিলিও মনে মনে সেটাই চাইছিল। তার সামনে দিয়ে একজন ছুরি-বেঁধা মানুষকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় তোলা হয়েছিল অ্যাম্বুলেন্সে, সেই দৃশ্যটা দেখার পর থেকেই তার গা গুলোচ্ছে। ভেতরে এসে সে ফ্লাস্ক থেকে জল খেল দু' গেলাশ।

হীরেন বললো, একটা খুব ক্ষতি হয়ে গেল। এই দাঙ্গা-

ফাঙ্গাগুলো লাগা উচিত বিকেলের দিকে। বেশ ভালভাবে খবর আর ছবি পাঠানো যায়, পরের দিন কাগজে টাটকা বেরিয়ে যায়। মাঝ রাত্তিরের ঘটনা, এখন খবর পাঠালেও ধরানো যাবে না। আর ছবি পাঠাবার তো কোশ্চেনই নেই।

মিলি বললো, এই দাঙ্গা এখন ক'দিন চলবে তার কি কোনো ঠিক আছে? যদি বেড়ে যায়?

হীরেন বললো, যদি দাঙ্গা বেড়ে যায় আর সাত-আট দিন ধরে চলে, তাহলে আমাদের এই হোটেলে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

সারা মুখে শঙ্কা ছড়িয়ে মিলি বললো, অ্যাঁ! তখন আমরা কী করবো?

ক্যামেরার ব্যাগ নামিয়ে রেখে হীরেন এগিয়ে এলো মিলির কাছে। তার গলায় দু'হাত রেখে বললো, তখন আমরা প্রেম করবো।

মিলি বললো, এই, সত্যি কী করে আমরা যাবো বল না?

হীরেন তার উত্তর না দিয়ে বললো, তোকে একটা চুমু খাবো?

মিলি সাংঘাতিক অবাক হয়ে গেল। হীরেনের কাছ থেকে সে যেন এরকম কথা আশাই করেনি। হীরেন কখনো এরকম কথা বলে না। মেয়ে হিসেবে কখনো কোনো আলাদা ব্যবহার করে না। আজই পুলিশের গাড়িতে মিলি যখন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তখনো হীরেন কোনোরকম সুযোগ নেয়নি। অনেক সময় হীরেন সাবলীলভাবে মিলির কাঁধে হাত রাখে, মেয়েরা স্পর্শেই বোঝে তার মধ্যে কোনো লোভ কিংবা প্রেম আছে কিনা!

একটু সরে যাবার চেষ্টা করে মিলি বললো, অ্যাই, কী ন্যাকামি হচ্ছে?

—একটা চুমু খাবো না? তোর শুচিবাই আছে নাকি?

—শুচিবাই আবার কী? হঠাৎ এসব তোর মাথায় ঢুকলো কেন?

—টায়ার্ড হয়ে এসেছি। একটা চুমু খেতে ইচ্ছে হয়েছে, তাতে দোষের কী আছে ?

—টায়ার্ড হয়ে এসেছিস, জল খা। ওসব চলবে না, আমার আপত্তি আছে।

—অ, বুঝেছি। তুই তো আবার শংকরের সঙ্গে নটঘট বাধিয়ে বসে আছিস। আমাকে চুমু খেলে সতীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁরে মিলি, তোর কি ধারণা, শংকর তোকে বিয়ে করবে ? ও গভীর জলের মাছ !

—তোর কী করে ধারণা হলো যে আমি শংকরকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত ?

—তুই বিয়ে করতে চাস না ?

—আমি সে কথা কখনো ভেবেই দেখিনি।

—আমি এমন কোনো মেয়ে দেখিনি, যে একটা বেশ চৌকোশ ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে, অথচ তাকে বিয়ে করার কথা ভাবে না।

—কখনো দেখিসনি ? তা হলে ভালো করে চেয়ে দ্যাখ, তোর চোখের সামনেই রয়েছে।

—তুই তাহলে ব্যতিক্রম !

দূরে সরে গিয়ে হীরেন হুইস্কির বোতলটা হাতে তুলে নিল।

মিলি বললো, তুই এখন আবার মদ খাবি ?

হীরেন বলল, বেশি না। মাত্র এক পেগ। চুমুর বদলে। খুব ভালো সাবস্টিটিউট। হুইস্কি কখনো বিট্রে করে না।

—তুই তা হলে গেল্ ওসব, আমি ঘরে, যাচ্ছি।

—তুই চলে গেলে আমি কিন্তু বেশি খাবো। বোতল শেষ করে ফেলবো। বোস একটুখানি, প্লিজ।

—ঠিক পাঁচ মিনিট।

—শংকর ছেলেটা ভালো। খুব ট্যালেণ্টেড, কিন্তু ছটফটে। মেয়েদের ব্যাপারে...

—অনুপস্থিত কারুকে নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়।

—আরে, একটু-আধটু পরচর্চা না করলে কি জমে? আমি কিন্তু শংকরের নামে নিন্দে করতে যাইনি।

—শংকর সম্পর্কে আমি অন্য কারুর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই না।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।

একটা চেয়ারে বসে মিলি ব্যাগ থেকে চিরুনী বার করে চুলের জট ছাড়াতে লাগলো। সারাদিন প্রচুর ঘোরাঘুরিতে অনেক ধুলো জমেছে।

এতক্ষণ পর হীরেন বললো, ওঃ, কী সাংঘাতিক দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম আজ। পুলিশের গাড়িটা না এসে পড়লে কী হতো বলা যায় না।

॥ ৪ ॥

সকালে ঘুম ভাঙার পর সীমা টের পেল তার একটু একটু জ্বর এসেছে।

ছলছল করছে চোখ, গলাব্যথা, সারা শরীরে অস্থিরতা। স্পষ্ট ঠাণ্ডা লাগার উপসর্গ। সীমা পারতপক্ষে স্কুল কামাই করে না। আজ স্কুলে না গেলেও চলে। কিন্তু মনে পড়ে গেল, আজ দুপুরে বিশাখার বাড়িতে খাবার নেমন্তন্ন। সহকর্মিণীদের মধ্যে বিশাখা তার খুব ঘনিষ্ঠ। বিশাখার বাড়িতে যেতেই হবে। স্কুলে না গেলে বিশাখা চিন্তা করবে।

রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। এখন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তবু উঠে পড়লো সীমা। পর পর দু'কাপ চা খেল। চা খেতে খেতে মনে হলো, শরীর বেশ ভালো হয়ে গেছে, জ্বরটর

আর আসবে না।

কিন্তু স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকতেই হু হু করে বেড়ে গেল শরীরের উত্তাপ, মাথা ঘুরতে লাগলো, মনে হলো যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। সীমা দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। তাকালো বন্ধ দরজার দিকে। ছিটকিনি তোলা। সত্যি যদি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত এখানে, তা হলে কেউ টেরও পেত না।

আস্তে আস্তে এসে সে ছিটকিনিতে আঙুল রাখলো।

অনেক গল্প শোনা যায়, বাথরুমের মধ্যে কারুর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হলো, কেউ দরজা খুলে ঢুকতে পারলো না, সেখানেই সে মরে গেল।

ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই, বাথরুমের দরজা সে খোলা রাখতেও পারতো, কিন্তু অভ্যেস।

এমনিতে সীমার তেমন অসুখ বিসুখ হয় না। মিলি চলে যাবার পরেই তার শরীর খারাপ হলো। মিলি গেছে মাত্র একদিন আগে। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতদিন।

আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়লো আবার। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এরপর আর স্কুলে যাওয়া যাবে না।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো সীমার। কথাটা বলেছিল প্রদীপ। এই কথাটা সে অনেক দিন আগেও একবার বলেছিল। এখানে, এই খাবার ঘরের টেবিলে বসে। বলেছিল, সীমা, তমি বড্ড বেশি মিলির মা হয়ে গেছ। সবসময় তুমি মা হয়ে থাকবে কেন? তুমি তো একটি নারী। তোমার আলাদা একটা সত্তা নেই?

বিনায়ক হঠাৎ চলে যায়। দিব্যি স্বাস্থ্যবান, হাসি-খুশী পুরুষ ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা ছিল তার। বেয়াল্লিশ বছরে হার্ট-অ্যাটাকের পর মাত্র একঘণ্টা বেঁচেছিল। সীমাকে একটা কথাও বলে যেতে পারেনি।

সীমা শুধু মেয়ের কথা ভেবেই একবারে ভেঙে পড়েনি।

মিলির তখন যা বয়েস, তার দিকে ভালো করে নজর না রাখলে অনেক বিপদের আশঙ্কা ছিল। তাই মিলির দিকেই সবটুকু মনোযোগ দিয়েছিল সীমা। নিজের কথা আর ভাবেনি।

বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে একবারে গুটিয়ে নিয়েছে সীমা সেই থেকে। বিশেষ কোথাও যায় না। মা আর মেয়ে মিলে একটা আলাদা ছোট জগৎ হয়ে গিয়েছিল। প্রদীপের কথা ঠিক, সে শুধু হয়ে গিয়েছিল মিলির মা।

সেই ছোট্ট জগৎটা ছেড়ে মিলি এখন বাইরে বেরিয়ে গেছে। সীমাকে এখন একা একা পড়ে থাকতে হবে এখানে। সে বাইরে বেরুবার পথ ভুলে গেছে।

প্রদীপও ছিল বিনায়কের বন্ধুদের মধ্যে একজন। জার্মানি থেকে ফিরে প্রদীপ তখন কলকাতায় ব্যবসা শুরু করেছে। বিনায়কের মৃত্যুর পর প্রদীপ খোঁজখবর নিতে আসতো প্রায়ই। প্রদীপের স্বভাব ছিল বিচিত্র। এক একদিন এসে বসে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সীমার অস্বস্তিবোধ হতো। মিলি কলেজে বেরিয়ে যাবার পর বাড়িতে আর কেউ নেই, শুধু সে আর প্রদীপ।

শুধু অস্বস্তি নয়, দৃষ্টিকটু ব্যাপার। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ রাখতেই হয়। তাকে আর প্রদীপকে নিয়ে লোকে কথা শুরু করতেই তো পারে। জার্মানিতে হয়তো এরকম চলে, এদেশে চলে না। প্রদীপ তা কিছুতেই বুঝবে না। অথচ প্রদীপের ব্যবহার খুবই ভদ্র, কোনোরকম অশোভন আচরণ তার কাছ থেকে আশঙ্কা করাই যায় না। তাকে হঠাৎ চলে যেতে বলবে কী করে সীমা!

তবু সীমা মাঝে মাঝেই নানান ছুতোয় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রাখতো, আকারে ইঙ্গিতে প্রদীপকে বলতো আপনি অফিসে যাবেন না? নতুন বিজনেস শুরু করেছেন, সবসময় খাটতে হয় না?

প্রদীপ হুঁ হাঁ করতো। ওঠার লক্ষণ দেখাতো না তবু।

জার্মান স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে দু'বছর আগে, প্রদীপের বাড়িতে কেউ নেই। ওর বাবা-মা থাকতেন বরোদায়। কলকাতায় কোনো আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। ওর নিঃসঙ্গতাটা অনুভব করা যেত। হয়তো সেই জন্যই সীমার নিঃসঙ্গতার কাছাকাছি এসে বসে থাকতো প্রদীপ।

একদিন বেলা এগারোটা আন্দাজ প্রদীপ বসেছিল খাবার টেবিলে, সীমা রান্নাঘরে রান্না শুরু করেছিল। পর পর তিন কাপ চা খেয়েছে প্রদীপ, তবু তার ওঠার নাম নেই, ওখান থেকেই সে দু'একটা কথা বলছিল সীমার সঙ্গে, সীমা রান্নাঘর থেকে উত্তর দিচ্ছিল।

একসময় প্রায় দশ-পনেরো মিনিট একেবারে চুপচাপ। সীমা মুখ ফিরিয়ে দু'একবার দেখেছিল, প্রদীপ একদৃষ্টিতে তার রান্না দেখছে।

হঠাৎ উঠে এসে প্রদীপ তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিল তুমি আমার সঙ্গে চলো।

সীমা একেবারে আমূল চমকে উঠেছিল।

প্রদীপ আগে কোনোদিন তার হাতও ধরেনি। কিন্তু এ স্পর্শ অন্যরকম।

সীমা বলেছিল, কোথায় যাবো?

প্রদীপ বলেছিল, আমার সঙ্গে। তুমি আমার কাছে থাকবে।

হঠাৎ অপমানে মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল সীমার। কী বলতে চায় প্রদীপ? এ দেশে যৌবন থাকতে থাকতে কোনো মেয়ে বিধবা হলে কিংবা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে, অনেকেই তাকে সহজলভ্যা মনে করে। দু'বছরের মধ্যেই এ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছিল সীমার। কত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও ইঙ্গিত দিয়েছে, গোপনে একটু ফুর্তি করার জন্য।

প্রদীপও সেই দলে ? মানুষ চেনা এত শক্ত !

প্রদীপ বলেছিল, তুমি একা একা থাকবে কেন ? আমিও তো একা একা থাকি। আমার ভালো লাগে না। আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না ?

সীমা একটু সরে গিয়ে তীক্ষ্ণভাবে বলেছিল, আমি তো একা থাকি না। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে থাকি।

প্রদীপ যেন সে কথা শুনতেই পেল না। সে সীমার চোখের দিকে চেয়ে আপনমনে বললো, তুমি রান্না করছো, স্টোভের আঁচে তোমার মুখখানা লালচে হয়ে গেছে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ ইচ্ছে করলো তোমাকে আদর করতে। কিন্তু বিনায়কের স্ত্রীকে তো আমি এমনি এমনি আদর করতে পারি না। তাই মনে হলো, আমরা দু'জনেই এখন একা, আমরা বিয়ে করছি না কেন ? সীমা, আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে ?

এও আর এক ধরনের আকস্মিকতা। সীমা থতোমতো খেয়ে কোনো কথাই বলতে পারলো না।

প্রদীপ আবার বললো, এসো না, আমরা বিয়ে করি।

সীমা খানিকটা ভয় পাওয়া গলায় বললো, না, না, তা হয় না, আমার মেয়ে আছে।

প্রদীপ বললো, মেয়ে আছে ? মিলি, হ্যাঁ, মিলিও আমাদের সঙ্গে থাকবে। মিলি তো আমায় বেশ পছন্দই করে। মিলি যে-রকম পড়াশুনা করছে, সে রকমই করবে।

—না, না, না, তা হয় না।

—কেন হয় না ?

—এরকম কথা আপনি আর কক্ষনো বলবেন না। আমি এরকম কথা চিন্তাও করি না।

—আমিও আগে চিন্তা করিনি। আজই হঠাৎ মনে হলো। এটা তো খারাপ কিছু নয়। তোমার আপত্তি কিসের ?

—আমি এ বিষয়ে আর কোনো আলোচনাই করতে চাই না।

—তুমি বাকি জীবনটা কীরকম ভাবে কাটাবে, সীমা? আমিও একটা আশ্রয় চাই। তুমি যদি আমাকে আশ্রয় দিতে—

—আপনি যা চাইছেন, তা আমার কাছে পাবেন না। প্লীজ, এরকম কথা যখন আপনার একবার মনে হয়েছে, আপনি আর আমার কাছে আসবেন না।

—আমি তোমার কাছে আর আসব না ?

—আমি আর আপনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারবো না।

—আমি কথাটা বলে অন্যায় করেছি ?

—দুপুরবেলা আমার একা থাকতেই ভালো লাগে।

প্রদীপ যেন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সীমা যে তাকে অপমান করছে, তাকে চলে যেতে বলছে, সেটাও যেন সে বুঝতে পারছিল না।

একটু বাদে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, ও, আই অ্যাম সরি।

সেই অবাক ভাবটাই মুখে রেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর কোনোদিন আসেনি।

প্রদীপের কলকাতার ব্যবসা ঠিকমতন জমলো না। সেসব গুটিয়ে ফেলে, সে আবার ফিরে গেল জার্মানি।

এতদিন পর আবার দেখা।

প্রদীপের সেদিনের ব্যবহার নিয়ে পরে অনেক ভেবেছে। প্রথম দিকে প্রদীপের ওপর তার বেশ রাগই ছিল। প্রদীপের যোগ্যতা ছিল অনেক, বিনায়কের বন্ধুদের মধ্যে প্রদীপকে বেশ পছন্দই করত সীমা। কিন্তু প্রদীপ হঠাৎ অমনভাবে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে যেন অপমান করেছিল।

কিছুদিন পরে অবশ্য সীমার মনটা কিছুটা নরম হয়! প্রদীপ

তো অন্য কোনোরকম অসভ্যতা কখনো করেনি। মিলির পড়া-শুনোর ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিল। একা একা সীমার কাছে বসে থাকতো অতক্ষণ, কিন্তু কোনোরকম সুযোগ নেবার তো চেষ্টা করেনি।

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াটা তো অন্যায় কিছু নয়। বিয়ে তো সামাজিক ভাবে স্বীকৃত একটা প্রথা। বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে সমাজ কখনো মাথা গলায় না। প্রদীপের প্রস্তাবে শুধু সীমা তার আপত্তি জানালেই তো পারতো, উল্টে তাকে অপমান করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সীমা আপত্তি জানিয়েছিল কেন? পরলোকে সীমার বিশ্বাস নেই। ওপর থেকে বিনায়ক দেখবে এবং দুঃখ পাবে, এরকম কথা সীমা ভাবে না। ভারতীয় হিন্দু বিধবাকে সারাজীবন বিধবা থাকতে হবে, এমন নীতিও সে মানে না।

পুরুষরা যদি বউ মারা যাবার পর আবার বিয়ে করতে পারে, মেয়েরাই বা পারবে না কেন? সীমার স্কুলের বান্ধবীদের মধ্যে দুজন এরকম বিয়ে করেছে, সীমা সে বিয়েতে গেছেও। তবে, নিজের ব্যাপারে তার কী বাধা ছিল? সবদিক ভেবে দেখলে, প্রদীপকে অপছন্দ করার কিছুই ছিল না। প্রদীপ সচ্ছল, সুপুরুষ, সবচেয়ে বড় কথা, অতি ভদ্র। মিলিকে সে ভালো-বাসতো, মিলির অযত্ন করতো না। তবে?

সীমার মনে তখন একটাই চিন্তা ছিল। মিলি কী ভাববে? মিলি তার বাবাকে অত ভালবাসতো, সে কি অন্য কারুকে বাবা বলে মেনে নিত? প্রদীপকে সে কাকা বলে ডাকতো, হঠাৎ একদিন তাকে বাবা বলতে পারতো কি?

ধরা যাক, মিলি সেটাও মেনে নিল। আজকাল তো এরকম হয়ই, ছেলে-মেয়েরা বুঝে যায়। কিন্তু মিলি কি ভাবতো না যে তার মা লোভী, তার মা তার বাবার স্মৃতি বেশিদিন ধরে রাখতে

পারলো না, আর একজন পুরুষকে অবলম্বন করলো! মেয়ের কাছে ছোট হয়ে যেত সীমা, মেয়ে কি তাকে আর ভালবাসতে পারতো আগের মতন? শুধু সেইটুকু হারাতে চায়নি বলেই সীমা আর অন্য কিছু চায়নি।

এখন মিলি লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে। এখন ওদের ধ্যান-ধারণা সব অন্যরকম। মিলি প্রায়ই হালকা সুরে বলে, মা, তুমি আর একটা বিয়ে করলে না কেন? তোমার চেহারা এত সুন্দর......জানো মা, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার ছেলে-বন্ধুদের মধ্যে কেউ না তোমার প্রেমে পড়ে যায়!

প্রদীপ আবার ফিরে এসেছে এত দিন বাদে। এর মধ্যে সে বিয়ে করেছে কিনা তা জানে না সীমা। কাল সে প্রসঙ্গ ওঠেনি। তবে, কলকাতায় ও একাই এসেছে। প্রদীপ আবার তাকে মিলির মা হবার বদলে আলাদা এক নারী হবার জন্য ডাক দিল।

হোটেলে দেখা করতে বলেছে। অন্য কেউ এরকম একটা প্রস্তাব দিলে তাকে দুশ্চরিত্র মনে করা যেত। কিন্তু প্রদীপকে তা কিছুতেই বলা যায় না। দুপুরে হোটেলে একা একা দেখা করার যে একটা অন্য দিক আছে, সেটা প্রদীপের মাথাতেই আসেনি, তাই সে অত সহজে ঐ কথাটা বলতে পেরেছে।

একটু বাদে সীমা আবার উঠে বসলো।

কপালে ঘাম জমেছে একটু একটু। মাথার ঝিমঝিমুনি ভাবটা নেই। জ্বর ছেড়ে গেছে। শরীরও বেশ ভালো মনে হচ্ছে। একী ব্যাপার, হঠাৎ জ্বর হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, আবার সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে!

তবে কি এটা মানসিক?

আসলে আজ স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না, সেইজন্যই এমন হচ্ছে?

মিলি বাড়িতে নেই, আজ তার ছুটি নেবার তো কোনো

মানেই হয় না। তা ছাড়া দুপুরে নেমন্তন্ন আছে, তাকে বেরুতেই হবে। অবশ্য, শরীর সত্যি খারাপ হলে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়াও চলতো না। এখন সীমা অনায়াসে তিন-চার দিন স্কুল কামাই করতে পারে।

তা হলে কি প্রদীপের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে যাবার কথাটা ভেবেই তার জ্বর আসছিল ?

না, হোটেলে সে যাবে না। সে প্রশ্নই ওঠে না।

প্রদীপ অপেক্ষা করে বসে থাকবে। তাকে কোনো খবর দেওয়া যাবে না। দোতলায় গিয়ে টেলিফোনে প্রদীপের সঙ্গে কথা বলা তার পক্ষে অসম্ভব। কালকেই প্রদীপকে না বলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন সীমা খুব আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিপুল হঠাৎ চলে গেল, ফ্ল্যাটে সে আর প্রদীপ একা, ঠিক আগের সেই দিনটার মতন সীমা ভেবেছিল, প্রদীপ বোধহয় সে কথা তুলবে।

প্রদীপ কী কথা বলতে চায় তাকে ?

প্রদীপ বলেছে, সে আর এখানে একা আসবে না। সীমা সেই যে বারণ করেছিল অতদিন আগে, প্রদীপ তা ঠিক মনে রেখেছে। সীমাকেই যেতে হবে। এটা প্রদীপ অন্যায় কিছু বলেনি। কিন্তু সীমা যাবে না, যাবে না।

মিলিকে নিয়ে যে ক্ষুদ্র জগতটা গড়েছিল সীমা, মিলি তার বাইরে চলে গেছে। কিন্তু সীমা যে বাইরে বেরুবার পথটাই ভুলে গেছে !

॥ ৫ ॥

হায়দ্রাবাদের দাঙ্গা চার দিনের মধ্যেও একটুও না কমে বরং ছড়িয়ে গেল আরও। এমনই অবস্থা যে হোটেল থেকেও বেরুনো

যায় না। হোটেলের ঘরে জানলা দিয়েই দেখা যায় যে ছুরি বন্দুক হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে খুনে-গুণ্ডারা। রাত্তিরবেলা দূরে দেখা যায় আগুন।

হীরেন এরই মধ্যে খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই একবার করে বেরিয়ে ছবি তুলে আনে। মিলিকে সে বেরুতে দেয় না। হীরেনের কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া যায়, তাই শুনে শুনে মিলি রিপোর্ট লিখে পাঠায়। কিন্তু দাঙ্গার খবর প্রথম দিন যেমন গুরুত্ব পায়, পরের দিকে আর তত থাকে না। এর মধ্যে আবাব কানপুরেও দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তাই এখানকাব খবরের গুরুত্ব কমে গেছে।

অফিস থেকে মিলি আর হীরেনকে টেলিফোনে জানানো হয়েছে ফিরে আসতে। কিন্তু ওরা ফিরবে কী করে?

রেলস্টেশনের কাছে মারামারি সবচেয়ে বেশি, তাই স্টেশনে যাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেন চলাচলও অনিয়মিত হয়ে গেছে। প্লেন আছে বটে, কিন্তু প্রচুর ভি আই পি এই সময় যাওয়া-আসা করছে বলে কোন সীট নেই। মিলি আর হীরেন জেনেছে যে আরও তিন দিনেব আগে ওদেব টিকিট কনফার্মড করা যাবে না।

এদিকে আর একটা বিপদ হয়েছে। ওদের টাকা ফুরিয়ে আসছে।

অফিস থেকে ওদের পাঁচ দিনের খরচ দেওয়া হয়েছিল। সে টাকা প্রায় শেষ। এরপর হোটেল ভাড়া দেবে কী করে?

হীরেন অফিসে টেলিফোন করে সে কথা জানিয়েছিল। সুব্রতদা বলেছেন, টাকা পাঠাবার তো কোনো উপায় নেই। তোমরা যে কোনোভাবে ম্যানেজ করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।

হোটেলে ঘরভাড়া তো দিতেই হবে, খাওয়ার খরচটা ওরা

বাঁচাচ্ছে। হোটেলের খাবারের দাম বেশী। তাই হীরেন কোনোক্রমে পাশের একটা দোকান থেকে রুটি, মাংস, তড়কা কিনে আনে, সস্তা হয়।

হীরেনের মদের স্টক শেষ। কোনো জায়গা থেকে মদ জোগাড় করতে না পেরে তার মেজাজ বেশ খাট্টা।

দুপুরবেলা এক ঘরে বসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর হীরেন বললো, মিলি, এই দাঙ্গা যদি আরও চলে, তা হলে যে হোটেলে বাঁধা থাকতে হবে!

মিলির মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতি সে সহ্য করতে পারছে না। মারামারি, খুনোখুনির কথা শুনলেই তার গা গুলোয়।

হীরেন বললো, আমি একলা থাকলে তো অসুবিধের কিছু ছিল না। আমি যে কোনো কায়দায় ঠিক বেরিয়ে যেতুম। কিন্তু তোকে নিয়েই তো মুসকিল।

মিলি এ কথাটাও অস্বীকার করতে পারলো না। রাস্তায় এখন একটিও মেয়ে দেখা যায় না। স্টেশনের কাছে কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, তাদের মধ্যে দু'জন মেয়েও ছিল। পুলিশ স্বীকার করেছে যে আরও বেশ কয়েকজন মহিলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হীরেন বললো, ছেলেতে আর মেয়েতে যে তফাত আছে, সেটা এবার বুঝলি তো? তোরা নারীমুক্তি-ফুক্তি কত কী বলিস, এটা মানতে চাস না।

মিলি বললো, তার জন্য তো বর্বর পুরুষরাই দায়ী! মেয়েদের গায়ে আগুন লাগায়, মেয়েদের ছুরি মারে।

—পুরুষদের মারবে, আর মেয়েদের মারবে না, এটা বুঝি সমান অধিকার হলো?

—বাজে বকিস না। শোন, পুলিশের গাড়ি আমাদের স্টেশন

পর্যন্ত পেঁছে দিতে পারে না ?

—পুলিশের গাড়ি আবার কবে থেকে ট্যাক্সির কাজ করে ?

—বাঃ, জার্নালিস্টদের পুলিশ একটু সার্ভিস দিতে পারে না ? তুই চেষ্টা করে দ্যাখ না ?

—এখানে আমার বদলে তুই চেষ্টা করলে বেশি কাজ হবে। হাত দেখিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি থামাবি, তারপর অবলা সেজে যাবি, তাতে তাদের দয়া হতে পারে, তখন আমি তোর লেজুড় সেজে যাবো। কিন্তু আমি খবর নিয়েছি, কলকাতার ট্রেন আজ ছাড়েনি। কালও ছাড়বে কিনা সন্দেহ।

—তা হলে কি হবে ?

—এরপর হোটেলের ভাড়াও দিতে পারবো না। খাওয়ার পয়সাও থাকবে না।

—হোটেল আমাদের কাগজের নামে ধার দেবে না ? আমরা ফিরে গিয়ে ওদের বিল মিটিয়ে দেবো !

—এই হোটেলের মালিক আমাদের কাগজের নামও শোনেনি। কোনোদিন চোখে দেখেনি। এরা সাউথ ইণ্ডিয়ার কাগজ পড়ে। ধার-ফার দেবে না। শোন, আজ থেকে একটা কাজ করা যাক। একটা ঘর ছেড়ে দিই।

—তার মানে ?

—শুধু শুধু দুটো ঘরের ভাড়া দিয়ে কী হবে ? একটা ঘরেই দিব্যি চলে যাবে। তুই খাটে শুবি, আমার মেঝেতে কার্পেটের ওপর একটা বালিশ পেলেই চলবে।

—দুজনে একঘরে শোবো ?

—আমার নাক ডাকে না।

—সে জন্য নয়।

—শোন মিলি, তুই সেদিন আমার চুমু খাওয়ার প্রস্তাব শুনে খুব একখানা লেকচার দিলি। তারপর বললি, শংকরের

সঙ্গে তোর অ্যাফেয়ার। ব্যস, চুকে গেছে। আমি কি এরপর তোর ওপর জোর জবরদস্তি করবো নাকি? আমাকে কি তোর সেরকম ক্যাডাভেরাস লোক মনে হয়?

—আমি সে কথাও বলছি না।

—তবে? তুই খাটে শুবি, আমি কার্পেটে। প্রমিজ করছি, তোকে আমি টাচ করবো না। হলো তো? টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে, তবু দুটো ঘর ভাড়া দিতে হবে?

—আমার দুল জোড়া বিক্রি করা যায় না?

—আমার প্রস্তাবটাতে তোর আপত্তি কিসের? আমি প্রমিজ করছি, তাও তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে। আমার বিশ্বাস হলেও অন্যরা কি কেউ বিশ্বাস করবে? তুই আর আমি একঘরে রাত কাটালাম, আমাদের মধ্যে কিছুই হলো না, তবু অন্য কেউ শুনলে ঠিক একটাই কথা ভাববে।

—অন্য কেউ মানে, শংকর! তাই তো! সে জানবে কী করে?

—আমাকে জিজ্ঞেস করলে কি আমি মিথ্যে কথা বলবো? যাকে ভালোবাসা যায়, তার কাছে এরকম একটা মিথ্যে বললে বাকি সবকিছুই মিথ্যে হয়ে যায়।

—কাঁচ খুকী! এখনো কিছুই শিখিসনি। যতই প্রেম-ভালোবাসা হোক, মিথ্যে না বললে জীবন চলে না। এরকম দু'-চারটে মিথ্যে হচ্ছে জীবনের টক-নুন-ঝাল! সে যাকগে, তুই রাজী না কোনোমতেই?

—আমি দুল বিক্রি করে দিতে রাজী আছি।

—আমি ওসব বিক্কিরি-ফিক্কিরির মধ্যে নেই। আমি এখন একটু বেরুচ্ছি। দেখি কোনো বাঙালীর বাড়ি খুঁজে পাই কিনা। পেলে তাদের কাছে আশ্রয় চাইবো। শুধু শুধু হোটেল ভাড়া

দিতে আমার গায়ে লাগছে।

—রাস্তায় এখনোও গোলমাল শোনা যাচ্ছে। তুই এর মধ্যে বেরুবি? না, হীরেন, থাক, তোর এখন যাবার দরকার নেই।

আহা রে, কী দরদ আমার জন্য! তুই কি আমার প্রেমিকা নাকি?

—প্রেমিকা না হই, বন্ধু তো হতো পারি!

—আমার সঙ্গে বিশ্বাস করে এক ঘরে শুতে চাস না, তা হলে তুই কিসের বন্ধু? তুই যদি আমার প্রেমিকা হতিস, আর এরকম একটা কোনো বিপদে পড়ে অন্য কোনো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে বাধ্য হতিস, তাহলেও আমি কিন্তু তোকে বিশ্বাস করতাম।

বারণ শুনলো না হীরেন, ঠিক বেরিয়ে গেল।

মিলির মনে পড়লো, তার মা একজন মামার কথা বলেছিল। তার নাম-ঠিকানা কিছুই নিয়ে আসা হয়নি। তখন মিলি বলেছিল হোটেল-ভাড়া বাঁচাবার জন্য আত্মীয়ের বাড়ি উঠবে কেন? এখন দেখা যাচ্ছে, ঠিকানাটা সঙ্গে আনলে খুব ভালো হতো। মায়ের কথা শুনলো না তখন।

অফিসের মাধ্যমে মাকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল কাকার ফ্ল্যাটে ফোন করার চেষ্টা করেছিল মিলি, কিন্তু কিছুতেই ঐ লাইনটা পাওয়া যাচ্ছে না।

হীরেন ফিরলো দেড় ঘণ্টার মধ্যেই।

মিলি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল, হীরেনের ডাক শুনে খুলে দিল।

হীরেন বললো, শালা, কোথায় বাঙালী নেই! পৃথিবীর সব জায়গায় বাঙালী। এখানেও গিজগিজ করছে। আগে খোঁজ করিনি কেন? খাওয়া-থাকার খরচ ফ্রি হয়ে যেত! প্রবাসী বাঙালীরা খুব অতিথিপরায়ণ হয়।

—কার খোঁজ পেলি ?

—এখান থেকে খুব কাছেই থাকেন মিঃ চ্যাটার্জি, খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার, চমৎকার কোয়ার্টার। ওর স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়েও আছে। ভদ্রমহিলা বেশ অ্যাকমপ্লিশড্। আমাকে কিছুই বলতে হলো না। আলাপ হবার পর উনি নিজে থেকেই বললেন, হোটেলে রয়েছেন কেন, আমাদের এখানে এসে থাকুন না !

—তুই রাজী হয়ে গেলি ?

—আমি তোর কথাও বলেছি। মিঃ চ্যাটার্জি আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই তোর ডেসপ্যাচ পড়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তোর ইন্টারভিউয়ের প্রশংসা করলেন। তোকেও ওঁরা নিয়ে যেতে চান। পাঁচটার সময় গাড়ি নিয়ে আসবেন। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে।

—আবার কী মুস্কিল ?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বললেন, ওঁদের একটা গেস্ট রুম আছে। দুটো খাট আছে। বুঝলি তো, একটা গেস্ট রুম। সেখানে আমরা দু'জনে থাকবো কী করে ? তোর মতন এক শুচিবাইগ্রস্ত মেয়ের সঙ্গে আমিই থাকতে চাই না। তা হলে হয় তোকে যেতে হয়, কিংবা আমাকে। ওঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো আমার চেয়ে তোকেই ওঁদের বেশি পছন্দ।

—না, না, তুই ব্যবস্থা করেছিস, তুই যা। আমি এখানে থেকে যাবো। হোটেলের একটা ঘরের ভাড়া আরও দু'দিন দেওয়া যাবে।

—আমার আপত্তি নেই। মিঃ চ্যাটার্জির কথা শুনে মনে হলো মালটাল খায়। আমাকেও খাওয়াবে। ওটাও ফ্রিতে হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলে এরপর তোর সম্পর্কে আমার আর কোনো দায়িত্ব রইলো না। আমি ওঁদের বাড়িতে গিয়ে আরামে থাকবো, দাঙ্গাবাজরা যদি হোটেল অ্যাটাক করে, তা হলে আমি কিছু জানি না।

—ওরকম ভয় দেখাসনি হীরেন। চলে গেলেও তুই কি আমার খোঁজখবর নিবি না ?

—রাত্তিরে যদি কেউ জোর করে তোর ঘরে ঢুকে পড়ে ?

—যাঃ, বাজে কথা বলিস না।

—কিছু বিশ্বাস নেই। এসব হোটেলে কিছু বিশ্বাস নেই। এখন তবু সবাই জানে যে তোর একজন বডিগার্ড আছে।

এই সময় দরজার কাছ থেকে একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, কে কার বডিগার্ড ?

মিলি আর হীরেন চমকে মুখ ফিরিয়ে দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, আরেঃ।

মুখে দুদিনের দাড়ি, ময়লা জামা আর জিন্সের প্যাণ্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কর। জিজ্ঞেস করলো, কী আলোচনা হচ্ছিল ?

হীরেন জিজ্ঞেস করলো, তুই কী করে এলি ?

শংকর অবহেলার সঙ্গে বললো, ট্রাকে।

—কোথা থেকে ?

—ব্যাঙ্গালোর থেকে।

—তার মানে ?

—এর মানে বোঝা খুব কঠিন নাকি ? তোর কী হয়েছে রে হীরেন, মাল-টাল পেটে পড়েনি বুঝি ? অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন ? ব্যাঙ্গালোর থেকে মাল বওয়া ট্রাকে চেপে চলে এলাম। মাঝখানে শুধু একবার ট্রাক বদলাতে হয়েছে।

—দাঙ্গার মধ্যে ট্রাক চলে এলো ?

—এলো তো। আমায় তো জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছিস। ট্রাকওয়ালারা কোনো কিছুতেই ভয় পায় না।

—তুই হায়দ্রাবাদ চলে এলি, অফিস থেকে তোকে এখানে পাঠালো ?

—গাড়লের মতো কথা বলিস না। অফিস থেকে তিনজনকে

এখানে পাঠাবে, হায়দ্রাবাদ কী এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ?

এতক্ষণ পর মিলি বললো, তা হলে তুমি হঠাৎ হায়দ্রাবাদেকেন ?

শংকর মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, এলাম তোমার জন্য, এটাও কি বলে দিতে হবে ? অফিস থেকে খবর পেলাম, তোমরা এখানে দাঙগার জন্য আটকে পড়েছো, হোটেলের নামটা জেনে নিয়ে সোজা চলে এলাম।

শংকর এমন তাচ্ছিল্যের সঙেগ বললো যেন কাজটা সত্যি খুব সোজা। মিলি আর হীরেন দু'জনেই বুঝতে পারলো, এতখানি পথ এই দাঙগার মধ্যে দিয়ে ট্রাকে চেপে এসে শঙ্কর যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছে।

হীরেন বললো, তুই যে হিন্দী সিনেমার হিরোর মতন একেবারে ঠিক টাইমে এসে গেলি। আমরা প্রায় ব্রোক। তোর কাছে টাকা-কড়ি আছে তো ?

শংকর জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললো, আছে। শোন, দু'দিন আমি চান করিনি। এখন চান করবো। বারোটার সময় একটা ধাবায় কিছু খেয়েছি বটে, কিন্তু আবার খিদে পেয়েছে। একটা কিছু ভদ্রলোকের মতন খাবার যোগাড় কর। আর চা।

হীরেন বললো, পয়সা যখন আছে তখন রুম সার্ভিস বললেই তো হয়। মিলি, ফোনে বলে দে।

শংকর স্নান করতে বাথরুমে ঢুকে গেল।

খানিক বাদে দাড়ি কামিয়ে, ফর্সা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে বেরিয়ে এসে বললো, আঃ! ঘুম পাচ্ছে। খাবারটা তোরা খেয়ে নে। আমার দরকার নেই। আমি এখন ঘুমোবো।

আর বিনা বাক্যব্যয়ে সে শুয়ে পড়লো মিলির বিছানায়। এক মিনিটের মধ্যে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মনে হলো, সে গভীর-ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার অনেকখানি ক্লান্তি জমে ছিল।

মিঃ চ্যাটার্জি যখন এলেন, তখনো শংকর ঘুমন্ত, তাকে জাগান

হলো না। টাকা বাঁচাবার আর প্রশ্ন নেই, তাই হোটেল না ছাড়লেও চলে। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি এত আন্তরিকতার সঙ্গে আতিথ্য দিতে চাইছেন যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। হীরেন তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল।

মিলিকে সে বললো, তোর তো এখন আর চিন্তা নেই, আসল বডিগার্ড এসে গেছে। শংকরই সব ম্যানেজ করবে। আমার কেটে পড়াই ভাল।

ঠিক হলো যে পরের দিন দুপুরে মিলি আর শংকরও মিঃ চ্যাটার্জি'দের বাড়িতে দুপুরে খেতে যাবে।

ওরা চলে যাবার পরেও মিলি শংকরের ঘুম ভাঙালো না। কিছুক্ষণ শংকরের কাছে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শংকর একেবারে শিশুর মতন ঘুমোচ্ছে।

শংকর জাগলো প্রায় রাত ন'টার সময়।

উঠেই বললো, মিলি, দারুণ খিদে পেয়েছে। শীগগির খাবারের অর্ডার দাও। আর তোমার কাছে বিস্কুট-ফিস্কুট কিছু থাকলে দাও।

হীরেন বিস্কিট আর চানাচুর রেখে গেছে মিলির কাছে। মিলি সেসব বার করে দিল।

শংকর চার-পাঁচটা বিস্কিট খেয়ে ফেললো প্রায় গোগ্রাসে। তারপর এক গেলাশ জল খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে বললো, হীরেনটা কোথায়?

মিলি মিঃ চ্যাটার্জি'র বাড়ির বৃত্তান্তটা শংকরকে জানালো।

শংকর ভুরু কুঁচকে বললো, হোটেল ছেড়ে অন্য লোকের বাড়িতে চলে গেছে? নিশ্চয়ই মাল খাবার লোভে গেছে। ইডিয়েটটা ধৈর্য ধরতে পারলো না? আমার কাছে যে বোতল আছে, সেটা জানলে বোধহয় যেত না।

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে এসে মিলিকে জড়িয়ে ধরে ছেলে-

মানুষী গলায় শংকর বললো, মিলি, মিলি, মিলি, মিলি! বড্ড মন কেমন করছিল তোর জন্য। প্রথম রাত্তিরে তোরা দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলি? খুব ভয় পেয়েছিলি, তাই না?

মিলি বললো. হ্যাঁ, অত বাজে, ভেবেছিলাম হোটেলে ফিরতে পারবো না।

—বেশ একটা অভিজ্ঞতা হলো, কী বল? এরকম আরও হবে!

—আমি এই ধরনের রিপোর্টিং করতে চাই না। তুমি ট্রাকে করে এতদূর চলে এলে? রাস্তায় যদি কিছু একটা হয়ে যেত!

—এক জায়গায় কী হয়েছিল জানিস? সন্ধ্যেবেলায় রোড ব্লক করে রাস্তা আটকাতে চেয়েছিল। ধরতে পারলে ট্রাকে আগুন দিত, আমাদেরও মারতো টারতো নিশ্চয়ই। কিন্তু ট্রাক ড্রাইভারটা খুব স্পীডে চালাচ্ছিল। আমি বললাম, চালাও, চালাও, থেমো না। সে লোকটা করলো কী, রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল ধানক্ষেতে, সমান স্পীডে বেরিয়ে গেল। ট্রাকটা উল্টে যাবার চান্স ছিল, কিন্তু রিস্ক নেওয়াটাই ঠিক হয়েছে।

—উঃ, ভাবলেই বিচ্ছিরি লাগে। মানুষ কেন মানুষকে মারতে চায়?

—পৃথিবীটাই এরকম।এটা কার ঘর রে? তোর না হীরেনের?

—এটা আমার ঘর। হীরেনের ঘরটা ছিল বারান্দার কোণে। ও তো ঘরটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। তুমি ওটাই নিতে পারো। ঐ ঘরের জানালা দিয়ে অনেকটা শহর দেখা যায়।

—এটা তোর ঘর! সিঙ্গল রুম। খাটটা তো বেশ বড়ই দেখছি। আমি এখানেই থেকে গেলে পারি। আর একটা ঘর নেবার দরকার কি?

—তোমার কাছে তো টাকা আছে। আর একটা ঘর নিতে পারো যখন—

শংকর হো হো করে হেসে উঠলো।

মিলিকে বুকে চেপে ধরে তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বললো, পাগলী! পয়সার প্রশ্ন আসছে কী করে? এক হোটেলে থাকবো, অথচ দু'জনে দুটো ঘরে শুতে যাবো কেন?

মিলি বললো, হীরেন কাল সকালে আসবে। ও দেখবে, তোর নামে কোনো ঘর বুক করা নেই। ও কী ভাববে?

—ও, হীরেনকে নিয়ে চিন্তা!

—কলকাতায় ফিরে ও সবাইকে বলে দেবে। আমার মায়ের কানে যদি পেঁছোয়?

মিলিকে ছেড়ে দিয়ে শংকর নিজের ব্যাগ থেকে রামের বোতল বার করলো। টেবিলে দুটো গেলাশ ছিল, দুটোতেই ঢাললো খানিকটা। জল-টল মিশিয়ে মিলির হাতে একটা গেলাশ দিয়ে বললো, বোস, খুব সিরিয়াস কথা আছে।

শংকর বসলো চেয়ারে, মিলি বিছানায়।

শংকর একটা সিগারেট ধরিয়ে দু'টান দিয়ে মিলির দিকে এগিয়ে দিল। মিলি সেটা নিয়ে ঠেকালো ঠোঁটে।

শংকর বললো, যোধপুর পার্কে একটা বেশ সুন্দর ছোট্ট ফ্ল্যাট পেয়ে যাচ্ছি আগামী মাস থেকে। ফিবে গিয়ে তুই দেখবি, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, তোর পছন্দ হবে। দু'খানা ঘব, রান্নাঘবটা চমৎকার। আমি বাড়ি ছেড়ে ওখানে চলে আসছি। আমাদের বাড়িতে অনেক লোক, জয়েণ্ট ফ্যামিলি, জায়গা কম, আমি বাইবের লোকজনদের ডাকতে পারি না। আমি আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবো। আমার বাবাও রাজী হয়েছেন। এবার, মিলি দেবী, আমি ফর্মালি প্রপোজ করছি। আপনি কি আমায় বিয়ে করতে রাজী আছেন?

—বিয়ে?

—হ্যাঁ, বিয়ে, অনেক বাউণ্ডুলেপনা করেছি ভাই। এখন একটু ঘর-সংসার করতে চাই। একটু শান্ত হয়ে না বসলে নিজস্ব

কাজকর্মও কিছু করা যাচ্ছে না।

—এটা কি সিরিয়াস কথা, না ইয়ার্কি? তোর মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তুই সত্যি যোধপুর পার্কে ফ্ল্যাট নিচ্ছিস?

—হ্যাঁ। ইয়ার্কি নয়। ফাইন্যাল ডিসিশান। তা হলে মিলি দেবী আজ রাত্তিরে আমরা হোটেলের এক ঘরে অনায়াসে শুতে পারি। কলকাতার গিয়েই আমরা সবাইকে জানিয়ে দেবো যে আমরা বিয়ে করছি। কেউ আর টু শব্দটি করবে না।

—কিন্তু শংকর, আমি যে এখন বিয়ে করতে চাই না।

শংকর এমনই অবাক হলো, যেন চেয়ার থেকে পড়ে যাবে।

চোখ দুটো গোল করে বললো, তার মানে? তুই বিয়ে করতে চাস না আমাকে? তুই মন বদলে ফেলেছিস?

মিলি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একটুক্ষণ নীরব থেকে বললো, এখনো মন ঠিক করতে পারিনি।

—মন ঠিক করতে পারিসনি? তার মানে, তোর জীবনে আরও কেউ আছে? মাই গড! না, না, না, না, আর যে আছে, আমি তার নাম জানতে চাই না! কিন্তু আমি কোনো কম্পিটিশানও যেতে চাই না, মিলি! ঠিক আছে, আমি অন্য ঘরে চলে যাচ্ছি। হোটেলের ডেস্কে গিয়ে কথা বলে দেখি।

মিলি দ্রুত উঠে এসে শংকরের হাঁটু ধরে বসে পড়লো পায়ের কাছে।

কাতর মুখ তুলে বললো, না, তা নয়। অন্য কেউ নেই। শংকর, আমি এখনো বিয়ের জন্য ঠিক তৈরি নই।

শংকর ভুরু কুঁচকে বললো, এ আবার কী ধাঁধার মতন কথা!

মিলি বললো, আমার বাড়িতে প্রবলেম আছে। তুই তো আমার মাকে দেখেছিস? মা আর আমি একসঙ্গে থাকি। আমি এখন মাকে ছেড়ে থাকবো কি করে?

—তুই কি বাচ্চা মেয়ে নাকি রে মিলি, যে মাকে ছেড়ে থাকতে পারবি না ?

—তুই বুঝতে পারছিস না। আমি ছেড়ে থাকতে পারবো, কারণ আমি তোকে পাচ্ছি। কিন্তু মা কী নিয়ে থাকবে ? মা'র যে আর কেউ নেই। আমার কোনো ভাই-বোন নেই।

—তোর মা অত্যন্ত ফাইন লেডি, খুবই রিজনেবল। আমাকে অপছন্দ করেন না, সেটা আমি বুঝেছি। ওঁকে বললে উনি নিশ্চিত রাজী হবেন। মেয়ে বিয়ের পর অন্য বাড়িতে চলে যায়, তা কি উনি জানেন না ? সে জন্য উনি তৈরি হননি মনে মনে ?

—আমার মা আমার চেয়েও অনেক ছেলেমানুষ ধরনের। আমার ওপর সবসময় নির্ভর করে থাকেন।

—এটা তোর ভুল ধারণা। তোর একটা আলাদা নিজস্ব জীবন থাকবে, এটা নিশ্চয়ই উনি বোঝেন। তাছাড়া খুব দূরে তো চলে যাচ্ছি না, একই শহরে থাকবো, প্রায় রোজই দেখা হতে পারে।

—তবু মা কী করে একা থাকবে ? না শংকর, আরও অন্তত কয়েকটা বছর না গেলে আমি বিয়ের কথা ভাবতে পারছি না।

—মায়ের জন্য কোনো মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, এ তো বড় অদ্ভুত কথা! তোর মা শুনলে তিনিই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাবেন। চল, কলকাতায় গিয়ে তোর মায়ের সঙ্গে কথা বলবো।

—মা তো রাজী হবেই কিন্তু · আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না ? যোধপুরের ফ্ল্যাটটায় দুটো ঘর, বিয়ের পর মাকেও আমাদের কাছে রাখতে পারি না ?

—না, ভাই, সেটা সম্ভব নয়। বিয়ের পর শাশুড়ীকে নিয়ে সংসার করা, সেটা অতি হাসির ব্যাপার। আমাদের বাইয়ের একটা জীবন আছে কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে আমরা একটা নিজস্ব

ছোট পৃথিবী গড়ে তুলবো, সেখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই আপাতত। এটা তোর উদ্ভট প্রস্তাব, মিলি।

—তোর যদি শুধু মা থাকতেন, আর কেউ নেই, তা হলে তিনি তো তোর কাছেই থাকতেন, তখন তিনজনই হতো। মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম তো অনেক জায়গাতেই হয়। মেয়েরা তো শাশুড়ীর সঙ্গে থাকে, ছেলেরা কেন শাশুড়ীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে না?

—ওসব তুলনা ফুলনা দিয়ে লাভ নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তোর মা চাকরি করছেন। [illegible] কোনো [illegible] মধ্যে [illegible]ছেন না। তুই [illegible] খোঁজ খবর নিতে যাবি। উনিও আসবেন মাঝে মাঝে। এটা কি খারাপ ব্যবস্থা? একটা সময় ছেলে মেয়েরা কাছে থাকে [illegible] বাবা-মাদের দূরে সরে যেতেই তো হয়।

শংকরের উত্তর শোনার পর মিলি চুপ করে বসে রইলো। তার চোখ জ্বালা করছে, তবু সে কান্না আসতে দিচ্ছে না।

শংকরও চেয়ার ছেড়ে বসে পড়লো কার্পেটের ওপর।

মিলির কাঁধে হাত দিয়ে শংকর বললো, আর একটা কথা বলবো, মুখ তোল, তাকা আমার দিকে।

মিলি মুখ তুলে বললো, কী?

শংকর বললো, তুই হয়তো অন্য একটা দিক ভেবে দেখিসনি। তোর বাবার মৃত্যুর পর তোর মা তোর জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস করেছেন। তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন, এ সবই ঠিক। নিজস্ব কোনো সাধ-আহ্লাদ রাখেননি। কিন্তু তুই কি মনে করিস, মা তোর বাবার স্মৃতি আঁকড়ে সারাজীবন পড়ে থাকবেন, তাঁর জীবনে আর কিছুই থাকবে না?

মিলি বললো, আমি মোটেই সেরকম মনে করি না। একজনের মৃত্যুর জন্য দুটো জীবন কেন নষ্ট হবে? মা আবার নতুন করে

জীবন শুরু করলে আমি তা মেনে নিতাম। কিন্তু মা যে অন্য কারুর সঙ্গে মিশতেই চায় না।

—সেটা তোর জন্যও তো হতে পারে।

—আমার জন্য? আমি কতবার বলেছি—

—তোর বাবার মৃত্যুর সময় তোর মায়ের বয়েস বেশ কম ছিল। এখনো খুব বেশি না, তোর দিদি বলে মনে হয়, চেহারাও যথেষ্ট সুন্দর আছে। অন্য কারুর সঙ্গে তাঁর ভাব-ভালবাসা কিংবা বন্ধুত্ব তো হতেই পারে।

—তা তো হতেই পারতো। কিন্তু মায়ের মানসিক গঠনটাই যে সে রকম নয়। বড্ড ঘরকুনো, ঘর ছেড়ে বেরোতেই চায় না।

—কারণ সেই ঘরে তুই ছিলি। তুই তাঁর বন্ধন। এখন তুই চলে এলে উনি মুক্তি পাবেন। তোর উচিত মাকে এখন সেই মুক্তি উপহার দেওয়া। এটাই হবে তোর প্রতিদান।

মিলি গভীর বিস্ময়ে শংকরের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আস্তে আস্তে যেন উপলব্ধি করলো ব্যাপারটা। তার মুখ হাসিতে ছেয়ে গেল।

মাকে মুক্তি দেবার কথা ভেবে সে নিজেই যেন বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

শংকর তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, তা হলে আজ থেকেই শুরু হলো আমাদের বিবাহ-বাসর।

আলপনা আর শিখা

জি পি ও'র সামনে থেকে বাড়ি-ফেরার বাসের পেছনের দরজা দিয়ে উঠলো আলপনা। এ সময় ভিড় তো থাকবেই। সকাল-বেলায় রোদ দুপুরে চড়া হয়, গায়ে বেঁধে, বিকেলে মেঘলা আকাশে অসহ্য গুমোট, এরকমই চলছে এখন দিনের পর দিন, তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন দুপুরে বেশ জোর কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে বিকেলে ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, মুখের ঘাম আর বিরক্তি মুছে যায়। দুপুরে অফিসে বসে জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগে, তখন রাস্তায় যারা ঘোরাঘুরি করতে বাধ্য হয় তাদেরই দুর্ভোগ, যারা জানলা দিয়ে দেখে তারা আনন্দ পায়। আলপনার মনে হয়, মানুষের জীবনটাও এরকমই, একই বৃষ্টির জন্য কেউ বিরক্ত, কেউ খুশী। বিকেল বেলা গরম আর ভিড়টা অভ্যেস হয়ে গেছে, তারই মধ্যে কোনোদিন ফুরফুরে হাওয়া দিলে কিংবা ফেরার বাসে একটা বসবার জায়গা পেলে মনে হয়, আঃ, বেঁচে থাকাটা কী চমৎকার!

আজ দুপুরে বৃষ্টি হয়ে গেছে, গরম নেই, কিন্তু বাসে উঠে বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। প্রত্যাশা কি আর সব দিন মেটে? দাঁড়িয়ে যেতে আলপনা অভ্যস্ত, আজ সে একটু বেশি জিনিসপত্র কিনে ফেলেছে, দু'হাত জোড়া। অফিস থেকে বেরিয়ে আলপনা রোজই টুকাটাকি বাজার করে। বি-বা-দী বাগ অঞ্চলের ফুটপাথ-গুলোতে কী না পাওয়া যায়, চুলের ফিতে থেকে শুরু করে কোয়ার্টজের সস্তার হাতঘড়ি পর্যন্ত। আলপনা আজ বেলুন-চাকিই কিনেছে, বাড়ির কাছাকাছি কোন দোকানে এ জিনিস পাওয়া যায়

না, ক'দিন ধরে অসুবিধে হচ্ছে খুবই। তিন্নি গরম গরম রুটি খুব ভালোবাসে। তিন্নির জন্য একটা বড় খেলনাও কিনেছে, একটা ট্রেনের ইঞ্জিন, রীতিমতন চলে।

মেয়ের জন্য একটু বেশিই খেলনা কেনে আলপনা। পরশুই আর একটা কিনেছিল। না চাইতেই তিন্নি নতুন নতুন খেলনা পায়। মেয়েকে এত খেলনা কিনে দিয়ে আলপনা কি নিজের সাধই মেটাচ্ছে? সে ছেলেবেলায় এত কিছু পায়নি। আলপনা বোঝে যে সে মেয়েকে বেশি বেশি আদর দেয়। কিন্তু দু'জনের কাছ থেকে যতটা আদর পাওয়ার কথা তিন্নির, তা যে একাই দিতে হয় আলপনাকে।

দুটো হাতই জোড়া, হ্যাণ্ডেল ধরতে অসুবিধে হচ্ছে আলপনার। মেয়েদের সব সীট ভর্তি। ঝাঁকুনি লাগলেই আলপনা হেলে যাচ্ছে। এমনিতেই দাঁড়িয়ে গেলে কিছু কিছু পুরুষ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, আলপনা ব্যালান্স রাখতে না পারলে তো কথাই নেই।

অনেকে হাতের জিনিসপত্র বসে-থাকা যাত্রীদের ধরতে দেয়। আলপনা যে কেন পারে না। তার মনে হয় যদি কারুর মুখে সামান্য আপত্তির ভাবও ফুটে ওঠে। মুখের রেখার হের-ফের দেখেই আলপনা যেন মানুষের মনের ভেতরটা দেখতে পায়। তার ধারণা, সে দেখতে পায়।

প্রত্যেকদিন বাড়ি ফেরার পরই তিন্নি ছুটে আসে, মায়ের হাতের জিনিসগুলো সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেট খুলে তার দেখা চাই-ই। শুধু যে খেলনার লোভেই সে খোলে তা নয়। সব কিছুতেই যেন তার আবিষ্কারের আনন্দ। যদি আলপনা এক প্যাকেট টিপ কেনে, তা প্রত্যেকটি রঙের টিপ সে আলাদা আলাদা করে দেখবে। আর যদি নতুন কোনো খেলনা পেয়ে যায়, তা হলে সে মায়ের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। সদ্য ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে তিন্নি, আজকালকার ইংলিশ মিডিয়ামে কথায় কথায় থ্যাঙ্ক ইউ

বলতে শেখায়। তিন্নি শুরু করেছিল, আলপনা বলে দিয়েছে, খবরদার, আমাকে থ্যাংক ইউ বলবি না। ওসব সাহেব মেমরা বলে। আমাদের দেশে মাকে কিংবা মাসি-দিদিমাদের থ্যাংক ইউ বলতে নেই। এখন তিন্নি মায়ের দিকে অপলক কয়েক মুহূর্ত শুধু একটু হাসে।

সেই হাসিটুকু দেখার জন্য আলপনা বাসের ভিড়, দাঁড়িয়ে যাওয়ার কষ্ট সব সহ্য করতে রাজি আছে। এমনকি অন্য যাত্রী-দের খুচরো অসভ্যতাও।

অধিকাংশ পুরুষই কনুই দিয়ে বুক দুটো ছুঁয়ে দেবার চেষ্টা করে। ওতে ওরা কী আনন্দ পায় কে জানে! কনুইয়ের ডগায় কি কোনো সুখের অনুভূতি হতে পারে? কেউ কেউ পেছনটায় হাত বুলিয়ে দেয়। আর যারা আরও দুঃসাহসী, তারা বেশি ভিড়ের সুযোগ নিয়ে চকিতে একবার নিতম্ব খামচে ধরে। এই সব পুরুষরা কি বোঝে না যে মেয়েরা এসবে একটুও আনন্দ পায় না? সারাদিন অফিসে খেটেখুটে, হাতে জিনিসপত্র নিয়ে ঠাসাঠাসি বাসে যেতে যেতে শরীরের যে-কোনো জায়গায় পুরুষের গোপন স্পর্শে আনন্দ পাবার বদলে বিরক্তি ও রাগে-দুঃখে মন ভরে যায়। সব কিছুরই একটা বিশেষ সময় ও পরিবেশ আছে। প্রেম, ভালোবাসার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, শারীরিক আনন্দেরও তো একটা প্রস্তুতি চাই।

এই সব লোকগুলো নিজেরা কী আনন্দ পায় কে জানে, মেয়ে-দের কষ্ট দিতেই চায়। কিংবা মেয়েদের নারীত্বে একটা আঘাত দিয়েই ওদের আনন্দ।

আলপনা জানে, আপত্তি জানিয়েও কোনো লাভ নেই। সে নিজে কখনো কিছু বলেনি, কিন্তু দু'একবার দেখছে যে অন্য কোনো মেয়ে রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেই নানারকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে, ট্যাক্সিতে যেতে পারেন না। কেউ

বলে প্রাইভেট গাড়িতে যাওয়ার অভ্যেস মনে হচ্ছে। কেউ কেউ বলে, পুরুষদেরই আজকাল সব দোষ। মেয়েরা যা খুশী করতে পারে, কিন্তু পুরুষদের নামে নালিশ জানাতেই···।

এই সব কথা চিন্তা করলেই ঘৃণায় আলপনার নাক কুঁচকে যায়!

আলপনা নীচু হয়ে একবার জানলা দিয়ে দেখলো, বাসটা সবে বউবাজারের মোড়ে এসে থেমেছে। এখনো অনেক দেরি!

আলপনার কলেজের বান্ধবী সেমন্তী কাজ করে টেলিফোন অফিসে। আলপনা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আড্ডা দিতে যায়। পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে সেমন্তীর সঙ্গেই শুধু যোগাযোগ আছে। চমৎকার মেয়ে সেমন্তী, খুবই কাজের মেয়ে, অফিসে তার বেশ সুনাম, মাথা ঠাণ্ডা, নিজের দুটো বাচ্চা সমেত সংসার সামলায়, আবার চাকরিও করে। এ ছাড়াও তার একজন পুরোনো প্রেমিক আছে, তাকেও দেখতে যায় মাঝে মাঝে, সেটা খানিকটা গোপন বটে, কিন্তু আলপনা জানে, ওদের সম্পর্কটা এখনো প্রায় প্লেটোনিক। আলপনা সেমন্তীকে কোনো দোষ দিতে পারে না।

সেমন্তী প্রায়ই বলে, আলপনা, তুই যে সব পুরুষ মানুষের ওপরেই রেগে থাকিস, এটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। সব পুরুষই কি সমান হতে পারে? সব মেয়েই যেমন একরকম নয়।

আলপনা বলে, যুক্তি দিয়ে আমি সে কথাটা বুঝি! আমাদের পাড়ার হেবো গুন্ডা আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কি আমি এক সারিতে বসাতে পারি? কিন্তু আমি যাদের রোজ দেখি, তারা যে···

সেমন্তী হাসতে হাসতে বলে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে তুলনা দেবার দরকার নেই। মহাপুরুষদেরও আমরা দেখা না পেতে পারি কিন্তু অসভ্য, ইতর ধরনের পুরুষও যেমন আছে, তেমনি সাধারণ, সভ্য-ভদ্র মানুষও তো কম নেই। না হলে দেশটা

চলছে কী করে? সেই জন্যই মনটাকে খোলা রাখতে হয়।

আলপনা বলে, অনেক সভ্য, ভদ্র মানুষকেও দেখেছি।

বাসটা হঠাৎ ব্রেক কষায় আলপনা হুমড়ি খেয়ে পড়লো সামনের দিকে। এক হাত থেকে খসে গেল বেলুন-চাকির প্যাকেটটা। একজন লোক সেটা তুলে দিতে গিয়ে আলপনার উরুতে খানিকটা চাপ দিল ইচ্ছে করে।

আলপনার কান্না পেয়ে গেল। সমান ভাড়াই দিতে হয়, তবু বসে যাওয়া আর দাঁড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কত তফাৎ। অন্তত একটা সীটের পেছনে ভর দিয়েও যদি দাঁড়ানো যেত।

যে-লোকটা বেলুন-চাকি তুলে দিয়েছে, তাকে পর্যন্ত ধন্যবাদ জানালো না আলপনা, লোকটার দিকে সে চেয়েও দেখলো না। অন্য লোকরা হয়তো তাকেই অভদ্র কিংবা অকৃতজ্ঞ ভাববে। কিন্তু আলপনা জানে, ঐ লোকটিকে সামান্য প্রশ্রয় দিলেই ও আরও জ্বালাতন করতে চাইবে।

এবার আলপনা লক্ষ করলো, বাসের সামনের দিকের দরজার কাছেই যে সীট, তাতে একজন মহিলার পাশে বসে আছে একজন পুরুষ।

কলেজ-জীবনে আলপনা ট্রামে-বাসে কোনো পুরুষ শিভালরি দেখিয়ে জায়গা ছেড়ে দিলেও বসতো না। তখন আলপনা ভাবতো, নারী-পুরুষ সবাই সমান। মেয়েদের জন্য আলাদা সীটই বা সংরক্ষিত থাকবে কেন? এখন বছরের পর বছর অফিস যাওয়া-আসার সময় ভিড়ের বাসে কষ্ট পেয়ে ওসব চিন্তা ঘুচে গেছে মাথা থেকে। এখন বাসে উঠেই সে লোভীর মতন লেডিজ সীটগুলোর দিকে তাকায়। বসার জায়গা পেলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় অসভ্য লোকগুলোর অত্যাচার থেকে।

অন্য দিকের দরজার কাছের সীটটার পেঁছোতে হলে অনেকটা ভিড় ঠেলে যেতে হবে। আরও আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে

সেটুকু কষ্ট করাও ভালো। হাতের প্যাকেট দুটো দিয়ে বুকে আড়াল করে রাখলো আলপনা, তারপর এগোতে লাগলো একটু একটু করে। সামনের স্টপে বাস থামার আগেই আলপনাকে পৌঁছোতে হবে। না হলে যদি আর একটা মেয়ে উঠে পড়ে!

একজন মহিলা ও পুরুষ এমনভাবে বসে আছে যে দেখেই বোঝা যায়, ওরা স্বামী স্ত্রী নয়, বন্ধু নয়। অপরিচিত। একটা খালি জায়গা পেয়ে লোকটি বসে পড়েছে। এখন আলপনা এসে দাঁড়াবার পরও লোকটি তাকে না-দেখার ভাণ করে বাইরের দিকে চেয়ে রইল জানলা দিয়ে।

আলপনা বললো, একটু জায়গাটা ছেড়ে দিন প্লীজ!

লোকটি তবু শুনলো না। মনোযোগ দিয়ে রাস্তা দেখছে।

আলপনা এবার খানিকটা কঠিন গলায় বললো, এই যে শুনছেন, জায়গাটা ছেড়ে দিন, উঠুন!

লোকটি গা মোচড়ালো। চটি খুলে রেখেছিল, চটি পরলো। তারপর অসীম অবজ্ঞার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো।

আলপনা প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বসে পড়লো এবার!

পরম স্বস্তিতে তার বলতে ইচ্ছে করলো, আঃ!

সত্যিই কত তফাৎ। ভারি প্যাকেট দুটো ধরে হাত ব্যথা করতে হবে না, কোলের ওপর রেখেছে। জানলা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। দাঁড়িয়ে থাকলে হাওয়াও টের পাওয়া যায় না, বাইরেটাও দেখা যায় না, দেখতে হয় শুধু মানুষের ঘাড়।

একটা লোককে এভাবে উঠতে বলতে এখনো আলপনার খারাপ লাগে। কিন্তু মেয়েদের আলাদা সীটের যখন ব্যবস্থা আছেই, তখন আলপনাকে দেখেই কি লোকটার জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল না? খুব কোনো বৃদ্ধ কিংবা শিশু-কোলে জননীকে দেখে আলপনা নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়। এখনো সেরকম কেউ এলে আলপনা উঠে দাঁড়াবে।

বাসে উঠে বসবার জায়গা না পেলে ক্ষোভ হয়, কিন্তু কখনো নিজের জায়গাটা অন্য কারুকে ছেড়ে দিলে এক ধরনের আত্ম-ত্যাগের অহংকারও বোধ করা যায়।

ভালো করে গুছিয়ে বসে আলপনা রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো।

এক একদিন আলপনা সেমন্তীর সঙ্গে অফিস থেকে ফেরে। সে সব দিনে ভিড়ের বাসেও কোনো কষ্ট হয় না। দু'জন থাকলে গল্পে-গল্পে সময়টা কেটে যায়। দু'জন থাকলে অন্য লোকরাও বিরক্ত করতে সাহস পায় না। একা থাকলেই নানারকম উৎপাত, নিত্য নতুন ঘটনা। সব জায়গাতেই মেয়েদের একা থাকার নানান অসুবিধে।

আলপনার পাশের মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কোথায় থাকেন?

আলপনা চমকে সেদিকে তাকালো, এতক্ষণ সে হলুদ রঙের ওপর গোলাপি বুটি দেওয়া টাঙাইল শাড়িটা ছাড়া মেয়েটির মুখ ভালো করে দেখেইনি।

আলপনাকে দেখলে ঠিক ঠিক তার বত্রিশ বছর বয়েসটা বোঝা যায়। আজকাল একেবারেই সাজগোজ করে না বলে, কেউ কেউ পঁয়তিরিশ-ছত্রিশও মনে করতে পারে। কিন্তু এ মেয়েটির মুখের ভাব কচি কচি, ছিমছাম গড়ন, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক, ওর বয়েস তিরিশও হতে পারে, তেইশ হওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়। সারল্য-মাখা উজ্জ্বল চোখ। প্রকৃত সরল না হয়েও এরকম সারল্য তৈরি করে নিতে পারে কেউ কেউ। মেয়েটির চেহারায় চাকচিক্য আছে।

আলপনা শিউরে উঠলো। যেন সর্বাঙ্গে বিষমাখা এক রমণী বসে আছে তার পাশে। একটু ছোঁয়া লাগলেই তার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অচেনা নয়, এই মেয়েটিকে জীবনে আগে মাত্র একবারই দেখেছে আলপনা, তবু চিনতে কোনো ভুল হলো না। শিখা নাগ!

মেয়েটি বিনীত, নরম ভঙ্গিতে আবার বললো, আপনি তো আর সি আই টি রোডের বাড়িতে থাকেন না? একদিন খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। আলপনাদি, একদিন আপনার সঙ্গে একটু।

আলপনা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। বাসটা বেশ জোরে ছুটছে, তবু সে চেঁচিয়ে কণ্ডাকটরকে বললো, রোকে দিন!

জিনিসপত্র এলোমেলোভাবে ধরে সে ঠেলেঠুলে যে দরজার কাছে। মনে হলো যেন সে চলন্ত বাস থে দেবে।

তখনই বাসটার গতি কমে এলো, সামনে কোনো একটা মোড়ে ট্রাফিকের লাল আলো। একটু থামতেই জ্ঞান শূন্যের মতন নেমে পড়লো আলপনা, তার হাত পড়লো তিন্নির খেলনাটা। সেটাকে কুড়োতে গিয়ে গেল অন্যটা, খসে গেল তার আঁচল। আলপনার ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাসটা আবার ছেড়ে চলে গেছে, আলপনা একবা চোখে সেদিকে তাকালো।

মাত্র বউবাজার-কলেজ স্ট্রিটের মোড়। এখান থেকে বাড়ি এখনো অনেক দূর। এরকম মাঝপথে অফিস ছ ট্রামে-বাসে ওঠাই প্রায় অসম্ভব। দরকার নেই, আল ভাড়া খরচ করতেও রাজি আছে। ট্যাক্সি পাওয়াও এ ধারে কাছে একটা রিক্সাও দেখা যাচ্ছে না। আল ফিরতেও রাজি আছে। অনেকটা সময় লাগবে, লাগুক

এরই মধ্যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, তার মা

আলপনা। তার মাথায় একটাই কথা ঘুরছে। শিখা নাগের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। ঐ বাসটা তো ভবানীপুর দিয়েই আসে, শিখা নাগ সেখান থেকে উঠেছে। কিন্তু অমন মিষ্টি গলায়, ন্যাকামি করে সে আলপনার সঙ্গে কথা বলতে এলো কোন্ সাহসে? পুরোনো বাড়িতে কেন দেখা করতে এসেছিল ঐ হারামজাদী? ও কী চায়?

॥ ২ ॥

ঠিক ন'বছর চার মাস আগে দুর্গাপুরে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিল আলপনা একটা দলের সঙ্গে। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তার আবৃত্তি করার শখ, কলেজে এসে দু'একটা নাটকেও ছোটখাটো অভিনয় করেছে, সেমন্তী পেত নায়িকার ভূমিকা। সেমন্তী ভালো অভিনয় করতো, আলপনা বুঝে গিয়েছিল, মঞ্চে অভিনয়ে সে সুবিধে করতে পারবে না। চলাফেরার সময় সে আড়ষ্টতা কাটাতে পারে না, হাত দু'খানা নিয়ে মুস্কিলে পড়ে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আবৃত্তিটা সে চালিয়ে দিতে পারে। সেমন্তীর অনুরোধে তাকে কয়েকবার শ্রুতি নাটকে অংশ নিতে হয়েছে। সেও প্রায় আবৃত্তিরই মতন। সেই রকমই একটা শ্রুতি-নাটকের ভূমিকা দিয়ে সেমন্তী তাকে টেনে নিয়ে গেল দুর্গাপুরে।

গ্র্যাজুয়েট হয়ে সেই বছরই ব্যাঙ্কের চাকরির একটা পরীক্ষা দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে আলপনা। তখনই ছুটি পাওয়ার খুব অসুবিধে, কিন্তু সেমন্তী ধমক দিয়ে বলেছিল, রবিবারের পর একটা সোমবার শুধু অ্যাবসেন্ট হবি। একদিনও কি তোর অসুখ হতে পারে না?

গিয়ে অবশ্য ভালো লেগেছিল খুবই। মঞ্চের ওপর থেকে দর্শকদের মুখোমুখি হওয়ার একটা উন্মাদনা আছে। ভুল করে

ফেলার ভয়ে বুক কাঁপে, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে উত্তেজনায় মুখের চামড়া যেন ফেটে পড়তে চায়, আবার লোকের হাততালি শুনে কুলুকুলু স্রোতের মতন আনন্দ বয়ে যায় রক্তের মধ্যে।

শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় দুটি অনুষ্ঠান। দু'দিনই জমে গিয়েছিল বেশ। দলে সব মিলিয়ে এগারোজন, ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল একটা পরিচ্ছন্ন গেস্ট হাউজে। দলটির নেতা ছিলেন অনুপমদা, অত্যন্ত চমৎকার মানুষ, হাসি-ঠাট্টা-মস্করা করেন সব সময়, কিন্তু কোনোরকম উচ্ছৃংখলতার প্রশ্রয় দেন না। আর সবারই তিরিশের মধ্যে বয়েস, অনুপমদা আরও পাঁচ ছ'বছরের বড়। এরকম একটা দলের সঙ্গে বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আগে হয়নি আলপনার, সে অনাবিল আনন্দ পেয়েছিল।

সেবারই আলাপ হয় বিশ্বতোষের সঙ্গে।

বিশ্বতোষ ছিল দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের একজন, কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীদের দেখাশুনোর ভার ছিল তার ওপর। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি ভদ্র ব্যবহার। বিশ্বতোষ দীর্ঘকায় যুবা, গায়ের রং মাজা-মাজা, মুখের ভাব মোলায়েম বা তেলতেলে নয়, বরং বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। এক একজনের কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝা যায় লোকটি খাঁটি, বিশ্বতোষের সেইরকম।

বাইরের কলশো-তে যারা যায়, হয় তারা উদ্যোক্তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থার গাফিলতিতে বিরক্ত হয়, অথবা তারা নিজেরাই নানারকম খুঁতখুতুনি দেখিয়ে উদ্যোক্তাদের জ্বালাতন করে। মানুষের জীবনে নিখুঁত ঠিকঠাক কোন কিছুই হয় না। কিংবা পুরো-পুরি ঠিকঠাক হলেও মানুষ সেটা মেনে নিতে পারে না।

দুর্গাপুরের উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থা কোনো ত্রুটি না দেখে দলের ছেলে মেয়েরা নানারকম বায়নাক্কা শুরু করে দিয়েছিল। সকালের

ব্রেকফাস্ট থেকে রাত্তিরের খাওয়া পর্যন্ত সবই বাড়াবাড়ি ধরনের, যতবার ইচ্ছে চা, গেস্টহাউজের বেয়ারাদের ডাকলেই আসে। বিশ্বতোষ সর্বক্ষণই প্রায় উপস্থিত। এর পরেও তাকে যদি যখন তখন এক বাণ্ডিল লাল ফিতে বা এক গোছা সেপটিপিন এনে দিতে বলা হয়, সে তৎক্ষণাৎ নিয়ে আসে। কেউ বরফ চায়, কেউ অসময়ে পান।

দ্বিতীয় রাত্তিরে সাড়ে দশটার সময় বিশ্বতোষ শেষবারের মতন এসেছিল ওদের খবর নিতে। সেমন্তী আর আলপনার একটা ঘর। দরজার সামনে উঁকি দিয়ে বিশ্বতোষ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনাদের আর কিছু লাগবে?

সেমন্তী দুষ্টুমি করে আলপনাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমার বন্ধুর খুব মাথা ধরেছে। এখন কি কোনো ওষুধের দোকান খোলা আছে? ওষুধ না পেলে যে ওর খুব কষ্ট হবে!

বিশ্বতোষ কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে চেয়ে রইলো আলপনার দিকে।

তারপর ফস করে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা প্যাকেট বার করে হেসে বলেছিল, ওষুধ আমার কাছেই আছে। কিন্তু আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, ওঁর এখন মাথা ধরেনি। মাথা ধরার অভিনয়টা উনি ভালো করতে পারছেন না।

সেমন্তী খিলখিল করে হেসে উঠলেও আলপনার বুক কেঁপে উঠেছিল বিশ্বতোষের সেই দৃষ্টি দেখে।

সবচেয়ে বেশী জমেছিল ফেরার সময় ট্রেনে।

বিশ্বতোষের বাড়ি কলকাতায়, কিন্তু ব্যবসা করে দুর্গাপুরে। সেদিন সেও ঐ দলটির সঙ্গে ফিরছিল কলকাতায়। দুর্গাপুরের ট্রেনে ভিড় ছিল না বেশি। একটা কামরার অনেকখানি জুড়ে বসে ওরা শুরু করেছিল গান আর আবৃত্তি। তখন জানা গেল বিশ্বতোষের একটা নতুন পরিচয়। এর আগে তাকে ধরে নেওয়া

হয়েছিল ফাংশানের উদ্যোক্তাদের একজন, এরা একটা টাইপ হয়। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে বোঝা গেল, সেও একজন শিল্পী ধরনের মানুষ। পেশায় সে ব্যবসায়ী হলেও সে একজন শৌখিন গায়কও বটে! উদাত্ত গানের গলা। অনেক গান তার মুখস্ত।

কয়েকটা গান শুনে সেমন্তীরা মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, আপনি নিজেই তো ফাংশানে গান গাইতে পারেন। গাইলেন না কেন?

বিশ্বতোষ লাজুকভাবে বলেছিল, এ এমন কিছু না। আমি তো কোথাও শিখিনি।

এই লজ্জা ও বিনয়টুকু ভালো লেগেছিল আলপনার। এর চেয়ে অনেক খারাপ গানের গলা নিয়েও অনেকে বেশি শিল্পী শিল্পী ভাব করে।

হাওড়া স্টেশানে পেঁছে যে-যার নিজস্ব দিকে চলে যাবে। আলপনা তখন থাকে দক্ষিণেশ্বরে, সেমন্তী আর দুর্জয় নামে একটি ছেলে শ্যামবাজারে। আলপনা ওদের সঙ্গে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে বাস বদলাবে। বিশ্বতোষ বলেছিল, আমিও নর্থে যাবো, চলুন না একটা ট্যাক্সিতেই যাই।

অনুপমদা আলপনার দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, আলপনা তো সবচেয়ে শেষে নামবে সে যেন ট্যাক্সি ভাড়াটা চেয়ে নেয়। সেমন্তী জানে যে আলপনা কতটা লাজুক, তাই শ্যামবাজারে সে নেমে যাবার সময় বললো, আমরা ট্যাক্সি ভাড়ার শেয়ারটা দিয়ে দিই? বিশ্বতোষ বলেছিল, না, না, ওটা আমার দায়িত্ব।

বিশ্বতোষের চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত যাবার কথা, কিন্তু আলপনাকে পেঁছতে সে চলে এলো দক্ষিনেশ্বরে। ট্যাক্সিতে যখন আর কেউ নেই, তখনো সে গাঢ় স্বরে কোনো কথা বলে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেনি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও তোলেনি। আলপনা কোন্ কোন্ কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসে,

ভবিষ্যতে আরও কোনো শ্রুতি নাটকে অংশ নিচ্ছে কি না এই সব কথাতেই সময় কেটে গেল।

দক্ষিণেশ্বরে আলপনার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবার পর বিশ্বতোষ জিজ্ঞেস করেছিল, আবার কি আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে ?

আলপনা বলেছিল, কী জানি, হতেও পারে।

বিশ্বতোষ বলেছিল, আপনি তো ব্যাঙ্কে কাজ করেন, আমি দুর্গাপুরেই থাকি বটে, তবু কাজের জন্য প্রায়ই কলকাতায় এসে ডালহাউসি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতে হয়। আপনাদের ব্যাঙ্কেও গেছি কয়েকবার।

সত্যিই দিন তিনেক পরে ব্যাঙ্কে এসে উপস্থিত বিশ্বতোষ। এমনি শুধু কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে একটু হাসি, দু'চারটে কথা।

প্রথম যেদিন বিশ্বতোষ আলপনাকে বাইরে ডাকলো, সেদিন আলপনা সেমন্তীকেও সঙ্গে নিয়েছিল। কলেজে পড়ার সময়েও আলপনা কোনো ছেলের সঙ্গে একা ঘোরাঘুরি করে নি। অফিসের কোনো সহকর্মীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। বিশ্বতোষই প্রথম পুরুষ, যে তাকে ডাক দিল বাইরের জগতে।

বিশ্বতোষের ব্যবহারের মধ্যে কোনো রকম অসৌজন্য নেই, হ্যাংলামি নেই। সেমন্তী যে-সব দিন ব্যস্ত থাকে, আসতে পারে না, সে রকম দুচারদিন বিশ্বতোষের সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আলপনার মনে হয়েছে, এই মানুষটি তো তার শরীরের ওপর লোভ করে না, তার সঙ্গ পেলেই খুশী হয়।

কৈশোরে পা দেবার পরই আলপনা টের পেয়েছিল, বিভিন্ন সম্পর্কের পুরুষরা তার শরীরের দিকে তাকায়, কিন্তু তার ভেতরের মানুষকে দেখতে চায় না। মেয়েদের সৌন্দর্যের সঙ্গে অনেকেই ফুলের উপমা দেয়। ফুলের মতন সুন্দর মুখখানা। কিন্তু ফুলের তো মন থাকে না! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা

লেখায় আলপনা পড়েছিল, শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম? এই লাইনটা অনেকবার একা একা বিড়বিড় করেছে আলপনা। তার মনে হয়েছে, মন থাকলেও কেই বা তার খোঁজ রাখে।'

বিশ্বতোষ তার মনকে ছুঁয়ে দিল।

সেমন্তী একদিন বললো, আর বেশিদিন ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করিস না। এবার বিয়ে করে ফেল!

আলপনা মানুষ হয়েছে এক রক্ষণশীল পরিবারের ঘেরাটোপের মধ্যে। বাবা মারা গেছেন আলপনার এতই অল্প বয়েসে যে বাবার কথা তার মনেই নেই তেমন। তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন মা, আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন বড় ভাইয়ের সংসারে। বড়মামা উদার মানুষ, কোনোদিন তিনি নিজের বোন ও তিন ভাগ্নে-ভাগ্নীকে বোঝা বলে মনে করেন নি। কিন্তু মামার বাড়িতে তখনো একান্নবর্তী পরিবার, সব মিলিয়ে কুড়ি-বাইশজন লোক। সব মানুষ তো সমান হয় না। যৌথ সংসারে যারা কোনো টাকা দিতে পারে না, তাদের প্রতি খানিকটা তাচ্ছিল্য বা করুণার ভাব কারুর কারুর মনে আসেই। বিশেষত ছোট ছেলে মেয়েরা এসব কথা অনেক সময় স্পষ্ট করে বলে ফেলে।

বড় মামা অবশ্য আলপনার তিন ভাই বোনকে লেখাপড়া শেখার সব রকম সুযোগ করে দিয়েছিলেন, এমনকি ওদের জন্য প্রাইভেট টিউটরও রাখা হয়েছিল। আলপনার দাদা সমীর এখন ইঞ্জিনীয়ার, সে ম্যাদ্রাসে চাকরি পেয়ে মাকে নিজের কাছে নিয়ে রেখেছে। আর এক দাদা কলেজে পড়ায়। মামার বাড়িতে মেয়েদের প্রতি শাসন ছিল কিছুটা কড়া। যখন তখন বাইরে যাওয়া যেত না। এক সময় আলপনার মনে হতো, গণ্ডিটা বড় ছোট। সে যখন ব্যাঙ্কে চাকরি পায়, তখন দুই মামীমা বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে রোজ অত দূরে ডালহাউসিতে চাকরি করতে

যাবে? তার চেয়ে বাড়ির কাছাকাছি কোনো ইস্কুলে কাজ নেওয়া বরং ভালো। কিন্তু ব্যাঙ্কের চাকরি পাওয়া অতি শক্ত ব্যাপার, আলপনা পরীক্ষা দিয়ে নিজের যোগ্যতায় পেয়েছে, সে ও চাকরি ছাড়তে চায় নি।

এই চাকরিতে জোর করে যোগ দেওয়াই তার প্রথম প্রতিবাদ। প্রথম মুক্তি। দুর্গাপুরে ফাংশান করতে যাওয়ায় শুধু মামীমারাই নয়, তার মায়েরও আপত্তি ছিল, আলপনা সেটাও মানে নি।

কিন্তু বিয়ে করাটা বন্ধন না মুক্তি?

চাকরি পাওয়ার পরই আলপনা চিন্তা করছিল মামা বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে সে বেরিয়ে আসবে। নিজে আলাদা কোথাও থাকবে। তার দাদা সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর প্রথম চাকরি পায় জামসেদপুরে। তখনই মা ও ভাই বোনদের মামা বাড়ি থেকে সরিয়ে এনে নিজের কাছে রাখার মতন তার উপার্জনের জোর ছিল না। সে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাতো। আলপনাও তার মাইনের সব টাকাটাই প্রায় তুলে দিত মায়ের হাতে, কিন্তু সে ভাবতো, এভাবে কতদিন সে থাকবে মামাদের সংসারে?

একটু মুক্তির স্বাদ পেয়ে আরও মুক্তির জন্য ছটফট করছিল আলপনা। কিন্তু বিয়ে করা মানে কি আর এক বন্ধনে জড়িয়ে পড়া?

এই নিয়ে যুক্তি তর্ক করছিল মনে মনে, একদিন জোয়ারে সব ভেসে গেল। ভালোবাসা তো জোয়ারেরই মতন। হঠাৎ একদিন আলপনা টের পেল প্রবল ভালোবাসা, সে বুঝলো, বিশ্ব-তোষের সঙ্গে তার জীবন সম্পূর্ণ জড়িয়ে গেছে। এই মানুষটি সৎ, এর ব্যবহার আন্তরিক, আলপনা বিশ্বতোষের মুখ দেখেই তা বুঝতে পারে। এই মানুষটিকে ছেড়ে সে আর থাকতে পারবে না।

গঙ্গার ধারটাই ছিল ওদের বেড়াবার প্রিয় জায়গা। একদিন

মেঘ ভরা আকাশের অকাল সন্ধ্যায় জলের ধারে ধারে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বতোষ। নদীর রং তখন নিবিড় ছায়াময়, একটা স্টিমবোট মাঝখান দিয়ে জল কেটে কেটে যাচ্ছে প্রায় নিঃশব্দে।

বিশ্বতোষ আলপনার কাঁধে হাত রেখে একটু চাপ দিল। সেই প্রথম।

আলপনা খুবই উপভোগ করলো সেই চাপ। যেন ধন্য হয়ে গেল তার শরীর। তার ইচ্ছে করলো, ঐ চওড়া বুকটায় মাথা রাখতে। মানুষ যত আশ্রয় খোঁজে, তার মধ্যে অন্য কারুর বুকই তো শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

আলপনা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা বিয়ে করবো না?

বিশ্বতোষ হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

আলপনা যেমন লজ্জা পেয়েছিল, তেমন অবাকও হয়েছিল। যে পারিবারিক সংস্কারের মধ্যে সে মানুষ, সেখানে বিবাহ-সম্পর্ক ছাড়া শারীরিক মিলন খুব ঘৃণ্য ব্যাপার। শরীর যখন শব্দ করে জেগে উঠেছে, অন্য শরীর চাইছে, তখন বিয়ে তো করতেই হবে।

আলপনা জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি হাসলে কেন?

বিশ্বতোষ বলেছিল, এই কথাটা আমি তোমার কাছ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম। তুমি যদি শুধু আমার বন্ধু থাকতে চাইতে, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না। আর বিয়ে করে এক সঙ্গে থাকতে তো আমি রাজিই আছি। কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলিনি, যদি তুমি প্রত্যাখ্যান করো! আমি প্রত্যাখ্যান করলে এর পরে আর তোমার সঙ্গে দেখাই করতে পারতাম না। কিন্তু শুধু বন্ধু থাকলে সারা জীবন দেখা করা যায়।

বিয়ের ব্যাপারে মামা বাড়ি থেকে প্রবল আপত্তি ছিল। মা-ও

রাজি হন নি, কান্নাকাটি করেছিলেন। জাত-ফাতের তফাৎ তো ছিলই। তা ছাড়াও প্রধান আপত্তির কারণ ছেলেটি চাকরি করে না। বিশ্বতোষ যে ব্যবসা করে, সেটা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারগুলি ব্যবসার কিছু বোঝে না, বরং ভয় পায়। তারা ভাবে একটা চাকরিই জীবনের পরম নির্ভরতা।

বিশ্বতোষ আলপনাকে বলেছিল, বিয়ের পরেও তুমি তোমার মাইনের অর্ধেক টাকা মাকে দেবে প্রতি মাসে। এ কথাটা ওঁদের জানিয়ে দিও।

কোনো আপত্তিই গ্রাহ্য করলো না আলপনা। বিশ্বতোষ যেদিন তাকে প্রথম চুম্বন করে, সেদিন রাজি হবার আগেই আলপনা ঠিক করে নিয়েছিল, এই মানুষটিই তার স্বামী।

বিয়ের সময় খুব সাহায্য করেছিল সেমন্তী।

আলপনার যেমন বাবা নেই, বিশ্বতোষেরও সে রকম মা নেই। তার বাবার একটা ছোট বাড়ি আছে চিড়িয়া মোড়ে, অন্য দুজন ভাই ও এক পিসিমা থাকেন সেখানে। বিয়ের পর বিশ্বতোষ সে বাড়িতে আলপনাকে তুলতে চায় নি। দ্রুত খোঁজা-খুঁজি করে পছন্দ করা হলো নতুন একটি ফ্ল্যাট। সেমন্তী সেটা সাজিয়ে দিল। সেখানেই রেজিস্ট্রারকে ডেকে ব্যবস্থা করা হলো বিয়ের, তারপর একটা ক্লাবে পঞ্চাশজনকে খাওয়ানো।

আলপনার মামা বাড়ির কেউ আসে নি। তার দাদা তাকে ছেলেবেলা থেকেই ভালোবাসে। সমীরও আপত্তি জানিয়েছিল বটে, কিন্তু বিয়ে যখন হচ্ছেই, তখন সে আপত্তি মুছে ফেলে, খবর পেয়ে এসেছিল জামসেদপুর থেকে। বাপের বাড়ির দিক থেকে আলপনার এক মাত্র উপহার তার দাদার দেওয়া একখানা শাড়ি।

নিজের বিয়ের দু দিন পর আলপনা সেমন্তীকে জিজ্ঞেস

করেছিল, তুই আমার জন্য এত করলি, আমি তোর জন্য কিছু করতে পারবো না?

সেমন্তী মুচকি হেসে বলেছিল, এবার দেখছি আমাকেও একটা বিয়ে করতে হবে।

সেমন্তী ভালোবেসে ফেলেছিল অনুপমদাকে। খেলা খেলা প্রেম নয়, সত্যিকারের গভীর ভালোবাসা। কিন্তু অনুপমদা বিবাহিত এবং তার দুটি ছেলে মেয়ে আছে। সবাই জানে, অনুপমদা বিবাহিত জীবনে সুখী নয়, তার স্ত্রীর মেজাজ মর্জির সঙ্গে অনুপমদার অনেক কিছুই মেলে না। তবু অনুপমদা সেমন্তীকে বলেছিলেন, তুমি আমার কাছে কিছুই পাবে না, সেমন্তী। আমি নিজের সংসার ভেঙে, ছেলে-মেয়েদের বঞ্চিত করে, তোমাকে নিজের করে নিতে পারবো না।

সেমন্তী আলপনাকে বলেছিল, দ্যাখ, অনুপমদা যে আমাকে সোজাসুজি সত্যি কথা বলে দিলেন, এই জন্য ওঁকে আমি আরও বেশি শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি। কাছে না পেলেও কি ভালোবাসা যায় না।

অনেকটা অনুপমদারই উদ্যোগে অমরেন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সেমন্তীর। ওদের অবশ্য নতুন ফ্ল্যাট খুঁজতে হয়নি। অমরেন্দ্র তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান, সে বাড়ি ছেড়ে আসবে কী করে? ওদের বাড়িও বেশ বড়।

সেমন্তীরও বিয়ে হলো বলে আলপনা খুব খুশী। কিন্তু দুই বান্ধবীর বাড়ির দূরত্ব অনেকখানি, তাই যোগাযোগ হয়ে গেল ক্ষীণ।

অবশ্য সেই সময়টা আলপনারও জীবন কাটছিল একটা ঘোরের মধ্যে। অন্য কারুর কথা তখন বিশেষ মনেও আসে না।

॥ ৩ ॥

বিশ্বতোষকে আলপনা যেমন মনে করেছিল, সে ঠিক তাই-ই। অত্যন্ত ভদ্র, রুচিশীল, দায়িত্ববান। স্বামী হিসেবে তো আদর্শ। আলপনার কোনো আকাঙ্ক্ষাই সে অপূর্ণ রাখে নি।

মাঝে মাঝে বেড়াতে চলে যেত দূরে কোথাও। কিন্তু হোটেলের ঘরে দরজা বন্ধ করেই ওরা কাটিয়ে দিত এক একটা পুরো দিন। পাহাড় কিংবা সমুদ্র দেখার বদলে ওরা পরস্পরকেই চোখ ভরে দেখতো। শারীরিক মিলনের উন্মাদনায় দুজনেই অক্লান্ত। স্বামী হয়েও বিশ্বতোষের ব্যবহার প্রেমিকের মতন, সে কখনো আলপনাকে এক গেলাস জলও গড়িয়ে দেবার আদেশ করে না। নিজেই নিয়ে নেয়। বেপরোয়া খরচ করে আলপনার জন্য নানারকম উপহার কেনে, এমনকি এক একদিন আলপনার ঘুম ভাঙার আগেই বিশ্বতোষ জেগে উঠে চুপি চুপি স্টোভ ধরায়। তারপর চা বানিয়ে এনে আলপনার শিয়রের কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে ডাকে, মহারানী, ওঠো, তোমার চা রেডি!

সাড়ে তিন বছর বাদে জন্মালো তিন্নি।

সে সময় খানিকটা জটিলতা হয়েছিল, তিন্নি জন্মাবার পর শরীর ভেঙে গিয়েছিল আলপনার। ব্যাঙ্ক থেকে লম্বা ছুটি নিতে হলো তাকে।

তখন দেখা গেল বিশ্বতোষের কি অসীম ধৈর্য। ঠিক যেন কোনো ট্রেইনিং পাওয়া নার্সের মতন সে শিশুটি, তার জননীর সেবা করছে। একজন আয়া রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু বিশ্বতোষ নিজে মেয়েকে কোলে নিয়ে ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াতো।

মাস ছয়েকের মধ্যে শরীর সেরে গেল আলপনার, তখন সে সব দায়িত্ব নিল। মেয়েকে দেখা, অফিস করা, সংসার সামলানো। তখন কি সে তার স্বামীর প্রতি মনোযোগ একটু কম দিয়েছিল?

একদিন বিশ্বতোষ খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বসেছিল, তুমি সব সময় এত মা মা সেজে থাকো কেন ?

বুঝতে না পেরে আলপনা হেসে বলেছিল, সে কি, মা হয়েছি, মা সেজে থাকবো না ?

বিশ্বতোষ বলেছিল, মা হয়েছো বলেই কি বাড়িতে সব সময় একটা ময়লা শাড়ি পরে থাকতে হবে ? মাথার চুলও আঁচড়াবার সময় পাও না।

আয়ার বদলে বাড়িতে সর্বক্ষণের একটি কাজের মেয়ে নিযুক্ত হয়েছে, তার নাম বেণু। আলপনা যখন অফিসে যায় তখন বেণুই তিন্নির দেখাশুনো করে। অফিসে কাজ করতে করতেও আলপনার মন পড়ে থাকে মেয়ের দিকে। বাড়ি ফিরেই সে তিন্নিকে বুকে তুলে নেয়।

ঐ টুকু মেয়ের জন্যই এত রকম কাজ থাকে যে নিজের সাজ-পোশাকের কথা আর খেয়ালই থাকে না আলপনার। এখন আর সে কোনো পার্টিতে যায় না, বাইরের কোনো হোটেলেও খেতে যায় না। চাকরি ছাড়া আর বাকি সবটা সময় সে তিন্নিকে দিতে চায়। বিশ্বতোষের এক বন্ধুর বিয়েতে যেতেই হয়েছিল কোন্নগর, সেই কয়েকটা ঘণ্টা তিন্নির জন্য বুকটা টনটন করছিল আলপনার।

তিন্নির জন্য একটা দোলনা-বিছানা কেনা হয়েছে, ওদের খাটের পাশেই সেটা রাখা থাকে। রাত্তিরে অন্তত তিন-চারবার আলপনা উঠে উঠে দেখে, মেয়ে বিছানা ভিজিয়েছে কিনা।

এক রাতে বিশ্বতোষের সঙ্গে মিলনের মাঝখানে হঠাৎ আলপনা বলে উঠলো, এই ছাড়ো, ছাড়ো। তিন্নি কাঁদছে।

বিশ্বতোষ বললো, এই কাঁদে নি তো।

আলপনা তবু বলল, হ্যাঁ কেঁদেছে। একটু থাম প্লিজ।

নিজেকে ছাড়িয়ে, বেশ-বাস ঠিক করে আলপনা দোলনাটার

কাছে গিয়ে দেখলো, তিনি কাঁদেনি বটে, কিন্তু ঘুমের মধ্যেই কাঁথা ভিজিয়ে ফেলেছে। আলপনা ঠিক বুঝেছিল। তখনই কাঁথা বদলাতে হলো, তিনি জেগে উঠে খুঁ খুঁ করায় তাকে ঘুম পাড়াতে হলো চাপড়ে চাপড়ে।

আবার বিছানায় ফিরে দেখলো, বিশ্বতোষ অন্য দিকে ফিরে শুয়ে আছে।

তাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে আলপনা বললো, এই, ঘুমিয়ে পড়লে?

বিশ্বতোষ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলো, পৃথিবীতে তুমিই প্রথম মা হও নি! মেয়েকে নিয়ে সর্বক্ষণ তোমার আদিখ্যেতা।

আলপনা খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, তুমি নিজের মেয়েকে হিংসে করছো নাকি?

সেই সময়টায় বিশ্বতোষ দুর্গাপুরে যাওয়াটা বাড়িয়ে দিল। বিয়ের পর প্রথম প্রথম মাসে দু' তিন বার গেলেই চলতো, এখন সে যেতে লাগলো সপ্তাহে দু' বার।

বিশ্বতোষ না থাকলে বেণু এসে ওদের ঘরের মেঝেতে বিছানা করে শোয়। ফ্ল্যাট বাড়িতে ভয়ের কিছু নেই। মেয়েকে নিয়ে আলপনার সময় কেটে যায়।

বিশ্বতোষ যখন কলকাতায় থাকে, তখন স্বামীর কর্তব্যে কোনো অবহেলা নেই। মেয়েকেও সে খুব আদর করে। নানা রকম খেলনা কিনে আনে।

আলপনা হঠাৎ একদিন খেয়াল করলো, বিশ্বতোষ আর আগের মতন তাকে আদর করে না, রাত্তিরে বিছানায় শুয়েও তাকে বুকে টানে না। নিজের ওপরেই রাগ হলো তার। সত্যিই তো স্বামীকে অবহেলা করেছে সে, স্বামীকে সে আর নিজে থেকে কিছুই দেয় না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আলপনা অনেক দিন পর আবার সাজগোজ

করলো। স্বামীর জন্য সে নিজের হাতে রান্না করলো তার কয়েকটা প্রিয় খাবার। ঘর সাজালো ফুল দিয়ে, তিন্নিকে ঘুম পাড়িয়ে দিল নটার মধ্যে।

বিশ্বতোষ ফিরলো একটু বেশি রাত্রে। কিছুটা মদ্য পান করে এসেছে, কিন্তু বেচাল নয়। ব্যবসার বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মদের আসরে তাকে দেখা দিতে হয়, আগে আলপনাও সঙ্গে গেছে এরকম কয়েকটা আসরে। বিশ্বতোষ বেশি পান করেনা। কোনোদিনও বেসামাল হয় না।

মদ্যপান করে এসেছে বলে খাওয়াও রুচি নেই, কিছুই খেল না প্রায় বিশ্বতোষ। ঘুমন্ত মেয়েকে একটা চুমু দিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। আজ যে বিশেষ ভাবে ফুল দিয়ে ঘর সাজানো হয়েছে। তা লক্ষই করলো না সে।

আলো নিভিয়ে দেবার পর আলপনা নিজেই চলে এলো স্বামীর বুকের কাছে। সে নিজেই শুরু করলো আদর। তারপর শরীরের খেলা। কিন্তু ঠিক যেন জমলো না। বিশ্বতোষের দিক থেকে কেমন যেন একটা দায় সারা ভাব। এক সময় সে বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে!

আলপনা অভিমান করে বললো, আর বুঝি আমাকে পছন্দ হয় না, তোমার ;

বিশ্বতোষ বললো, যাঃ পাগলী! তোকে আমি ভালবাসি। আজ আমার একটু ক্লান্ত লাগছে। সারাদিন খুব খাটাখাটুনি গেছে।

তখনই কেঁদে উঠলো তিন্নি।

সেই মাসেই টেলিফোন অফিসে চাকরি পেয়েছে সেমন্তী। কাছাকাছি অফিস বলে দুই বান্ধবীতে দেখা হয় প্রায় রোজই। ততদিনে সেমন্তীরও প্রথম সন্তানটি জন্মে গেছে। নিজেদের ছেলে মেয়েদের নিয়েই কথা হয় বেশি।

সেমন্তী আর অনুপমদার দলে থিয়েটার করে না। আলপনা আবৃত্তি করা ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম বিশ্বতোষ আলপনাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিত, আলপনারই আর যেতে ইচ্ছে করে না, মেয়ে জন্মাবার তো সে প্রশ্নই নেই।

সেমন্তী বলে, জানিস, এখন আমি বুঝেছি। শিল্পী হতে গেলে বিয়ে করা কিংবা বাচ্চা কাচ্চার মা হলে চলে না। শিল্পীরা সংসারীও হয় না।

আলপনা বলে, তা নয়। আমি অন্তত মনে করি, আমি খাঁটি শিল্পী নই, তাই টান বেশি ছিল না। অনেক শিল্পী তো বিয়েও করে, ছেলেমেয়ের জন্মও দেয়। তারা কি করে পারে?

সেমন্তী বলে, তারা পুরোপুরি মা হয় না। তাদের শিল্পী সত্তাটাই বেশি স্ট্রং। তাদের স্বামীরা গাদাবোটের মতন পেছনে পেছনে ঘোরে। সব স্বামীরা তো এরকম অবস্থা মেনেও নেয় না।

আলপনা বলে, আমি পুরোপুরি মা হয়েই বেশ আছি।

একদিন সেমন্তী বললো, হ্যাঁরে, কাল লাইট হাউজে দেখলুম নাইট শো-তে বিশ্বতোষ একটা মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখছে। তোর বোন-টোন কেউ বুঝি? তুই এলি না কেন? মেরিল স্ট্রিপের বেশ ভালো ছবি!

আলপনা অবিশ্বাসের সুরে বললো, কাল রাত্তিরে? তা কী করে হবে? ও তো পরশু দুর্গাপুরে গেছে। ফেরেনি তো।

—কাল যে আমি দেখলুম!

—তুই ভুল দেখেছিস। অন্য কেউ।

—আমি ভুল দেখেছি?

একটুক্ষণ চুপ থেকে সেমন্তী বললো, দ্যাখ আলপনা, ভাবিস না যে আমি তোর স্বামীর নামে নালিশ করছি। আমি ভুল দেখবো কেন? বিশ্বকে আমি চিনি না? ঠিকই চিনেছি।

মেয়েটির সঙ্গে বিশ্বর বেশি বেশি ঘনিষ্ঠতা আমার ঠিক পছন্দ হয় নি। একটু খটকা লেগেছিল। সেই জন্যই তোকে জিজ্ঞেস করলাম।

আলপনার মুখটা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন সমস্ত বিশ্ব সংসার দুলতে লাগল তার চোখের সামনে।

সেমন্তী তার হাত ছুঁয়ে বললো, তুই এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন? হয় তো ব্যাপারটা কিছুই না। বিয়ে করলেই যে কোন পুরুষ অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে পারবে না, কিংবা আর কারুর সঙ্গে মিশবে না, তার কোনো মানে নেই। আজকাল অত কনজারবেটিভ হলে চলে না। কিন্তু বিশ্বব সঙ্গে যে মেয়েটি ছিল সে যেন কেমন কেমন, ঠিক আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডের নয়। এই মেয়েটিকেও বোধহয় আমি আগে কোথাও দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না সেটা। তাই ভাবলাম, তোর বিয়ের সময় বোধহয় দেখেছি।

আলাপনা অস্ফুট ভাবে বললো, দুর্গাপুর থেকে ও কাল ফিরে এসেছে? রাত্তিরে ছিল কোথায়?

সেমন্তী বললো, হয়তো ওর নিজের বাড়িতে ছিল। বাবাকে দেখতে তো মাঝে মাঝে যায় বিশ্ব। শোন, এখনই তুই কিছু বলিস না। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত বউদের কোনো স্বামীই পছন্দ করে না। তুই শুধু ওর গতিবিধির ওপর একটু লক্ষ রাখিস এখন থেকে।

পরদিনই আলপনা বিশ্বতোষকে বললো, মেরিল স্ট্রিপের একটা ছবি এসেছে, আমাকে দেখাবে? আমার ফেভারিট অ্যাকট্রেস। অনেকদিন সিনেমা দেখি না।

বিশ্বতোষ খুশী হয়ে বললো, যাক, এই তো মতি ফিরেছে দেখছি! সন্ধ্যেবেলা একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আমরা বাইরে কোথাও খেয়ে নিতে পারি, তারপর নাইট শোতে সিনেমা দেখবো।

ঠিক আগেকার মতন খুব ভালো একটা রেস্তোরাঁয় বউকে খাওয়াতে নিয়ে গেল বিশ্বতোষ। যত্ন করে তাকে নামালো ট্যাক্সি থেকে, রেস্তোরাঁয় চেয়ার নিজে সরিয়ে বসতে বললো। অনেক খাওয়ার পরেও জোর করে আইসক্রীম খাওয়ালো একটা। হাসি-মজা করতে লাগলো সমানে। তার মুখে একটাও গ্লানির রেখা নেই। আলপনার মনে হলো, বিশ্বতোষের কিছুই বদলায় নি।

তারপব সিনেমা দেখা। সবচেয়ে দামি টিকিট। মাঝখানে যখন সিনেমাটা খুব জমে গেছে, তখন আলপনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তুমি এই ছাবটা আগে দেখেছো?

বিশ্বতোষ অবাক হয়ে বললো, না তো! আজকাল সময়ই পাই না। তোমার কল্যাণে তবু দেখা হলো।

আলপনা বুঝতে পারলো না, কে মিথ্যে কথা বলছে, তার স্বামী না তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী?

আলপনার তুলনায় সেমন্তী অনেক বেশী ফিল্ম ও থিয়েটার দেখে। বিশেষত গ্রুপ থিয়েটাবগুলোর সব নাটক তার দেখা চাই। নিজে আর অভিনয় না করলেও থিয়েটারের প্রতি ঝোঁক তার রয়ে গেছে। অনুপমদার সঙ্গেও দেখা করে নিয়মিত।

টিফিনের সময় গঙ্গার ধারে হাঁটতে গিয়ে সেমন্তী একদিন বললো, সেই মেয়েটিকে এবার চিনতে পেরেছি। একটা দলের নাটকে অভিনয় করে, নাটকটা মুক্ত অঙ্গনে চলছে নিয়মিত। মেয়েটার নাম শিখা নাগ।জানিস তো, আমার মাথায়একবার একটা দুশ্চিন্তা ঢুকলে সহজে ছাড়ি না। অনুপমদার কাছে খোঁজ খবর নিলাম। অনুপমদা এ লাইনের সবাইকেই চেনেন। উনি বললেন মেয়েটি এসেছে একটা গরীব ঘর থেকে। অভিনয় মন্দ করে না। কিন্তু মেয়েটি আসলে সোস্যাল ক্লাইমবার। কোনো একজন পয়সা ওয়ালা লোককে ধরে ওপরের দিকে উঠতে চায়। ইদানীং তার একজন বয় ফ্রেণ্ড জুটেছে। সে লোকটি দু'হাতে পয়সা খরচ

করে। খুব আমুদে স্বভাব, গানটান গাইতে পারে। ঐ দলটা যখন বাইরে কল শো পায়, বয় ফ্রেণ্ডটিও শিখার সঙ্গে যায়। থিয়েটার দলের সবাই তাকে চিনে গেছে।

আলপনা প্রথমে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না।

তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, সেই বয় ফ্রেণ্ডটির নাম জানে, অনুপমদা ?

সেমন্তী বললো, হ্যাঁ। বিশ্বতোষ চক্রবর্তী। আমি আরও অবাক হচ্ছি। বিশ্বর কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই, প্রকাশ্যেই মেলামেশা করছে মেয়েটার সঙ্গে।

আলপনা বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, আমি দেখবো। আমি মেয়েটাকে দেখতে চাই! তুই ব্যবস্থা কর।

দু'দিন বাদেই সেই নাটকের টিকিট কেটে আনলো সেমন্তী।

শিখা নাগ সে নাটকের নায়িকা নয়। দুজন উপনায়িকার একজন। মোট চারটে দৃশ্যে মঞ্চে উপস্থিত। ছোট খাটো চেহারা, তেমন কিছু রূপসী নয়, তুলনায় আলপনার চেয়ে তাকে খারাপই দেখতে বলবে লোকে, কিন্তু একটা চাকচিক্য আছে। অভিনয় বেশ ভালোই করে। একটা বিদায় দৃশ্যে চোখে জল এনে দেয়।

শেষ হবার পর বাইরে বেরিয়ে এসেছে দুজনে, হঠাৎ আলপনা ভূত দেখলো!

গ্রীন রুমের দিক থেকে বেরিয়ে আসছে বিশ্বতোষ, সঙ্গে শিখা। গাঢ় লাল রঙের শাড়ি পরা মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে।

কোনো রকম ধরা-পড়া চোরের ভাব ফুটে উঠলো না বিশ্বতোষের মুখে। খুব স্বাভাবিকভাবে হেসে সে বললো, আরে, তোমরা এই নাটক দেখতে এসেছো নাকি? কোথায় বসেছিলে? আমাকে বললে আমি ভালো সীট জোগাড় করে দিতাম।

তারপর সে তার সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বললো, শিখা, এই আমার স্ত্রী!

শিখা হাত জোড় করে বললো, নমস্কার।

নাটকের বাইরে তো নাটকীয় কিছু করে ফেলতে পারবে না আলপনা। তার শিক্ষা-দীক্ষা বাধা দেয়। আলপনার বুক ভেঙে যাচ্ছে, চোখ ঠেলে কান্না আসছে, তবু তাকে প্রতি নমস্কার জানাতে হলো।

শিখা আড় চোখে একবার শুধু দেখলো আলপনাকে। কোনো কথা বললো না। হ্যান্ডব্যাগ খুলে খুঁজতে লাগলো কী যেন।

বিশ্বতোষ স্ত্রী ও তার বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো নাটকটা? শিখার অভিনয় দারুণ না?

শিখা একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুললো।

সে রাতে আলপনার সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেল। সে চেঁচিয়ে কেঁদে আঁচড়ে কামড়ে ঝগড়া করলো বিশ্বতোষের সঙ্গে। আজ আর কিছুই অস্বীকার করলো না বিশ্বতোষ।

হ্যাঁ, থিয়েটার জগতের সঙ্গে সে বেশি মেশামেশি করছে আজকাল। সে নিজেই থিয়েটারের দলে যোগ দিতে চায়। কন্ট্রাকটারি ব্যবসা তার আর ভালো লাগছে না। ব্যবসা কমিয়ে দিয়ে সে অভিনয় করবে। সে এর মধ্যেই একটা নাটকে গান-গাওয়া একটা চরিত্রে রিহার্সাল দিচ্ছে।

হ্যাঁ, দুর্গাপুরের কাজ শেষ করে আগে আগে ফিরলে সে থিয়েটারের দলের কারো বাড়িতে থেকে যায় দু'এক রাত। ওদের সঙ্গ তার ভালো সময় কাটে।

হ্যাঁ, শিখা তার বান্ধবী। শিখাকে তার ভালো লাগে।

উন্মত্তের মতন চিৎকার করে আলপনা বলল, কেন কেন, কেন? আমি জানতে চাই, আমার তুলনায় শিখার কাছ থেকে তুমি কী বেশি পেয়েছো? কেন আমাকে তোমার আর পছন্দ হয় না?

বিশ্বতোষ বলল, কে বলেছে তোমাকে আমার পছন্দ হয় না? আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি। আমার মেয়েকে ভালোবাসি।

আর শিখাকেও…ইয়ে, ওকেও আমার ভালো লাগে। শিখাকে আমার ভালো লাগে, এটা আমি অস্বীকার করবো কী করে? ওর কাছে গেলে আমার অস্তিত্ব চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তা বলে তোমাকে তো আমি অবহেলা করি না!

—লোভী, দুশ্চরিত্র! তুমি আমাকে আর ওকে, এই দুটি মেয়েকেই হাতে রাখতে চাও! দু'জনকেও নিয়ে হারেম বানাতে চাও।

—মোটেই না। ছ'মাস ধরে শিখার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, কিন্তু ওকে তো কোনো ছুতোয় একদিনের জন্যও এ বাড়িতে আনিনি। তোমার সংসারের পবিত্রতা নষ্ট করি নি। একজন নারী কিংবা স্ত্রীর ভূমিকার চেয়ে মায়ের ভূমিকাই এখন তোমার বেশি পছন্দ। সেখানে তো আমি তোমায় ডিসটার্ব করি না।

—বারবার তুমি আমাকে মেয়ের কথা বলে খোঁটা দাও। মেয়ে কি একলা আমার?

—না, আমাদের দু'জনের। তা বলে আমি তো শুধু মেয়ের বাবা হয়ে যাইনি। মেয়ের জন্য আমার স্নেহ কম নেই। কিন্তু আমি একজন পুরুষ, আমার প্রেম, ভালোবাসার জন্য ব্যাকুলতা রয়েছে এখনো।

—প্রেম, ভালোবাসা? একটা বাজারের মেয়ের সঙ্গে তুমি যা করছো, তা প্রেম-ভালোবাসা!

—ভালো করে না জেনে অন্য মেয়েদের নামে দোষ দিতে নেই। শোনো আলপনা, আমি তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বলি।

—খবরদার, তুমি আমাকে ছোঁবে না। ঐ হাতে একটা নষ্ট মেয়েকে ছুঁয়েছো, ঐ নোংরা হাতে আর কোনোদিন আমাকে ছোঁবে না।

আলপনার দিকে বাড়ানো হাতটা সরিয়ে নিল বিশ্বতোষ। তারপর অদ্ভুত ভাবে হেসে বললো, তোমাকে আর কোনোদিন

ছুঁতে পারবো না, না? তুমি মহিয়ষী নারী। আমার সন্তানের জননী। এখন থেকে দূরে থেকে তোমাকে প্রণাম করবো।

তার পরদিনই বিশ্বতোষ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

নিজের জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নিল না, শুধু একটা ছোট ব্যাগ গুছিয়ে সে চলে গেল ভোর হবার আগেই। এই রকম ভাবেই সে দুর্গাপুরে যেত যখন তখন, কিন্তু জেগে ওঠে বিশ্বতোষকে না দেখেই আলপনা বুঝেছিল। এ যাওয়াটা চলে যাওয়া।

ভবানীপুরের অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকে শিখা। সেখানেই গিয়ে উঠলো বিশ্বতোষ।

মেয়েকে সেদিন থেকে আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরলো আলপনা। এক মিনিটের জন্যও তিন্নিকে কাছ ছাড়া করতে চায় না। তিন্নিই যে তার জীয়ন কাঠি। তিন্নি না থাকলে ক্রোধে-লজ্জায় আলপনা যে-কোনো মুহূর্তে আত্মহত্যা করে ফেলতে পারতো।

বিয়ে হলো না, কিছু না, একজন লোক আর একটি মেয়ের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে শুরু করে দিল, এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না আলপনা। এরকম ঘটনা একেবারে অভূতপূর্ব নয়, তা সে জানে। বইতে পড়েছে কিংবা ফিল্মে দেখেছে। কিন্তু মানুষটি যে তার নিজের স্বামী, মাত্র কয়েকদিন আগেও সে শুয়ে থাকতো আলপনার পাশে, কখনো সে খারাপ ব্যবহার করেনি, মেয়েকে সে এত আদর করতো, সেই মানুষটা ছেড়ে চলে গেল?

বিশ্বতোষ চলে গিয়েছিল মাসের শেষে, কয়েকদিন পর একজন লোক তার কাছ থেকে একটা খাম নিয়ে এলো। তার মধ্যে দেড় হাজার টাকা আর একটা ছোট চিঠি। টাকাটা সে মেয়ের জন্য পাঠিয়েছে।

খামটা ছুঁতেই ঘেন্না লাগছিল আলপনার!

চিঠিটা পড়ে অতিকষ্টে কান্না সামলালো আলপনা। লোক-টিকে বললো, টাকাকা ফেরৎ নিয়ে যাও। ওঁকে বলো, মেয়ের খরচ আমি নিজেই চালাতে পারবো।

আলপনা ধরেই নিল, বিশ্বতোষকে সে তার জীবন থেকে মুছে ফেলবে। দোষ করলে মানুষ শাস্তি পেতে পারে, কিন্তু আলপনা কী অপরাধ করেছে? মেয়ের যত্ন করা। মেয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া অন্যায়? নিজের সন্তানকে নিয়ে সময় ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল ঐ লোকটা? এরকম মানুষের সে মুখও দেখতে চায় না।

সেমন্তী কিন্তু অত সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়।

একটা লোক স্ত্রী ও সন্তানের দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে অম্লানবদনে ছেড়ে চলে যাবে, এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বিশ্বতোষকে শাস্তি নিতেই হবে। সে আলপনাকে বললো, পুলিশে ডায়েরি করতে। আলপনা তাতে রাজি নয়। যে কোনো লোককে জানাতেই তার লজ্জা। এ যেন তার শরীরের কোনো গোপন জায়গার একটা ক্ষত। কারুকে দেখানো যায় না।

আলপনাকে কিছু না জানিয়ে সেমন্তী নিজেই একদিন ধরলো শিখা নাগকে। একটা থিয়েটার ক্লাবের পার্টিতে। সেখানে বিশ্বতোষও ছিল, কিন্তু শিখাকে বাথরুমের নির্জনতায় মুখো-মুখি গিয়ে ধরলো সে। কাঁচা যৌবনের দর্পে মটমট করছে শিখা। সেমন্তী যখন বললো, তুমি মেয়ে হয়ে আর একটি মেয়ের সংসার ভাঙছো, তোমার লজ্জা করে না? শিখা তখন ঠোঁট উল্টে বললো, এমন কথা আমাকে বলছেন কেন? আপনার বন্ধুর সংসার আমার জন্য ভাঙছে না আগেই ভেঙে গেছে, তা আমি কী করে জানবো? আমি কি বিশ্বর পেছনে পেছনে ঘুরেছি না তাকে টোপ ফেলে ধরতে গেছি? সে যদি তার বউকে ফেলে আমার কাছে চলে আসে, তার জন্য আমি দায়ি

হতে যাবো কেন? নিশ্চয়ই আমার কাছে সে বেশি কিছু পায়, তাই আসে। আপনার কথায় তাকে আমি ফিরিয়ে দেবো? যা কিছু ত্যাগ শুধু আমাকেই করতে হবে, কারণ আমি গরিবের মেয়ে, আমার বংশ পরিচয়ের জোর নেই বলে?

শিখার কাছ থেকে এই ঘটনা শুনে পরে বিশ্বতোষও টেলিফোনে সেমন্তীর ওপর রাগারাগি করেছিল খুব। সেমন্তী সরাসরি বিশ্বতোষের কাছে কৈফিয়ৎ না চেয়ে শিখার কাছে গেল কেন? শিখার কোনো দোষ নেই। দোষ যদি দিতে হয়, বিশ্বতোষকেই দেওয়া উচিত। বিশ্বতোষ শিখাকে ভালোবেসে ফেলেছে, ভালোবাসার জন্য সে যে-কোনো অপবাদ ঘাড়ে নিতে রাজি আছে।

হঠাৎ রাগারাগি থামিয়ে বিশ্বতোষ হেসে বলেছিল, সেমন্তী, আপনার বান্ধবী আমাকে বলেছে, আমার নোংরা হাতের স্পর্শ সে ঘৃণা করে। নিজের স্ত্রীকে কখনো ছোঁওয়া চলবে না, এইভাবে কি কোনো দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায়?

তারপর পাঁচ বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। বিশ্বতোষের সঙ্গে আর দেখা হয়নি আলপনার। চাকরিটা ছিল বলেই সে আত্মসম্মান না খুইয়ে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। মাসে দু'বার সে বিশ্বতোষের সিঁথির বাড়িতে মেয়েকে পাঠিয়ে দেয়। বিশ্বতোষের বাবা নাতনীকে দেখতে চান। কখনো সখনো বিশ্বতোষও সেখানে আসে, তিন্নিকে নানারকম জিনিস দেয়।

আশ্চর্য ব্যাপার, বিশ্বতোষ এখনো ডিভোর্স নেবার চেষ্টা করেনি। আদালতে যায়নি। তবে সেমন্তীকে সে জানিয়েছিল যে আলপনা চাইলেই ডিভোর্স পেয়ে যাবে। বিশ্বতোষ কোনো বাধা দেবে না। আলপনা নিজের থেকে কোনো গরজ অনুভব করেনি। বিশ্বতোষ আর তার স্বামী নয়, তবু আইনত সে বিশ্বতোষের স্ত্রী। আলপনা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে। বিশ্ব

আমার আর কেউ নয়, কিন্তু সে তিন্নির বাবা, এইটুকু অন্তত সম্পর্ক থাক।

তিন্নি যেন কিছু বুঝতে না পারে। তিন্নি জানুক, তার বাবা আছে। কোনো কারণে তার বাবা দূরে থাকে।

॥ ৩ ॥

আলপনাদের ব্যাঙ্কটা দুটি তলা জুড়ে। আলপনা ওপরেই ফিক্সড ডিপোজিট সেকশানে বসে, কখনো কখনো তাকে একতলায় নামতে হয়। একদিন নীচে এসে দেখলো, সেভিংস অ্যাকাউণ্টের সংযুক্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। আলপনা একপলক সেদিকে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল। শিখা নাগ! ও এই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলেছে নাকি? সাহস তো কম নয়।

আলপনা উঠে গেল ওপরে। যে-কাজের জন্য সে একতলায় এসেছিল, সেটা আর মনেই পড়লো না।

দু'মিনিট বাদে একজন বেয়ারার সঙ্গে ওপরের চলে এলো শিখা। বেয়ারাটি বললো, দিদি, এই মহিলা আপনার নাম বলে-ছিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

এই মেয়েটি লাল রং ভালোবাসে। আজও পড়েছে একটা লাল শাড়ি, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক ছাড়া আর কোনো প্রসাধন নেই। ওর চুল কাটা নয়, পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে এক ঢাল চুল।

আলপনা মুখখানা কঠিন করেকাউণ্টারের সামনে বসে রইলো। যদি অ্যাকাউণ্ট হোলডার হয় তা হলে কথা বলতেই হবে।

শিখা নাগ সরাসরি আলপনার চোখে চোখ ফেলে বললো, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

আলপনা চুপ করে চেয়ে রইলো স্থির ভাবে।

শিখা নাগ বললো, এখানে ঠিক বলা যাবে না। আপনার

ঠিকানাটা যদি বলেন !

আলপনা ঝট করে নিচু হয়ে একটা কাঠের চাকতি তুলে প্রায় শিখার নাকের কাছে রাখলো। তাতে লেখা 'কাউণ্টার ক্লোজড'। তার পরেই সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল বাথরুমে। দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে। বাথরুমে কিছুটা সময় কাটালেই আজকের মতন ব্যাঙ্কিং আওয়ার শেষ হয়ে যাবে। তারপর সে আর কারুর সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য নয়।

রাগে আলপনার শরীর জ্বলছে। কী স্পর্ধা ঐ মেয়েটার, তার সঙ্গে কথা বলতে আসে। আলপনা কোনো দিনও কারুর সঙ্গে গলা তুলে ঝগড়া করেনি, তবু তার ইচ্ছে করছিল ঐ মেয়েটার মুখে পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মারতে।

পনেরো মিনিট বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে দেখলো চলে গেছে শিখা।

কেন ও এসেছিল ? কেন ?

রাগ কমে গিয়ে আস্তে আস্তে একটা ভয় ঢুকলো আলপনার মনে। কোনো ক্ষতি করার মতলবে আসেনি তো ?

মেয়ে যত বড় হচ্ছে, ততই একটা আশংকা জাগছে আলপনার। বাচ্চা মেয়ে তার মায়ের কাছে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তান বড় হয়ে গেলে বাবা তার কাস্টোডি চাইতে পারে। বিশ্বতোষ যদি তিন্নিকে কেড়ে নেয় ? তিন্নিকে একদিনও না দেখলে আলপনা বাঁচবে কী করে ?

বিশ্বতোষের সঙ্গে দেখা না হলেও তার কিছু কিছু খবর আলপনার কানে আসেই। এই ক'বছরেও শিখা আর ওর কোনো ছেলে মেয়ে হয়নি। থিয়েটারের মেয়ের পাল্লায় পড়ে বিশ্বতোষের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে, সে আর দুর্গাপুরে যায়ই না। তবু কিছু একটা রোজগার তার আছে, টাকা পয়সা খরচ করে বেশ। একটা গ্রুপ থিয়েটারের নাটকে ছোটখাটো পার্টও করে।

শিখাকে আলপনার কাছে পাঠাচ্ছে কেন বিশ্বতোষ ? কিছু একটা গূঢ় ষড়যন্ত্র আছে নিশ্চয়ই ! আলপনার সর্বনাশ করেছে যে মেয়েটা, সে কতখানি নির্লজ্জ বলে হাসি মুখে দেখা করতে আসতে পারে ?

সেমন্তীকে কথাটা জানাবার জন্য ফোন করলো আলপনা, সেমন্তী আজ অফিসে আসেনি ।

অফিসে ছুটির পর অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে আলপনা, একসময় সে হঠাৎ দেখলো, তার পাশে রয়েছে রণজয় ।

রণজয় হেসে জিজ্ঞেস করলো, এক্ষুণি বাড়ি ফিরতেই হবে ?

আলপনাও হেসে বললো, হ্যাঁ ।

রণজয় বললো, আমার জন্য আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় না ।

আলপনা বললো, আজ তো অসম্ভব । সোমবার আর বেস্পতিবার তিন্নি গানের ক্লাসে যায়, এ দু'দিন একটু দেরি করে ফেরা যায় । আজ তিন্নি আমার জন্য জানলার ধারে বসে থাকবে । আমাকে না দেখলে কিছুতেই দুধ খাবে না ।

রণজয় বললো, মেয়েকে আস্তে আস্তে বোঝাতে শেখাও, মিছিল কিংবা ট্রাফিক জ্যাম হলে তো তোমার সত্যিই দেরি হয়ে যেতে পারে ।

আলপনা বললো, তা শেখাবো, কিন্তু যেদিন মিছিল কিংবা টাফিক জ্যাম হবে না, সেদিন বাড়ি ফিরে তো মিথ্যে কথা বলতে পারবো না !

রণজয় বলল, আজ আমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না । তোমার সঙ্গে যেতে পারি । তিন্নির সঙ্গে লুডো খেলবো । তোমাকে ডিসটার্ব করবো না ।

একটু দ্বিধার সঙ্গে আলপনা বলতে যাচ্ছিল, আচ্ছা চলো— কিন্তু বললো না, থেমে গেল ।

মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে আলপনা বললো, বাসস্টপে হীরেন

বাবু দাঁড়িয়ে আছে।

—থাক না। তাতে কী আসে যায়!

—আমি যাবো নর্থে। তোমার বাড়ি সাউথে। তুমি আমার সঙ্গে এক বাসে উঠলেই হীরেনবাবু সন্দেহ করবে।

—এতে সন্দেহের কী আছে? আমি তোমার সঙ্গে একদিন যেতে পারি না?

—কাল অফিসে এসে এই নিয়ে বদ রসিকতা করবে।

—সেটা গ্রাহ্য না করলেই হয়!

—তুমি অগ্রাহ্য করতে পারো, কিন্তু আমি পারি না। প্লিজ রণজয়, আজ নয়, অন্য একদিন তিন্নির সঙ্গে খেলা করতে যেও!

রণজয় একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর ভেংচি কাটলো হীরেনবাবুর দিকে।

আলপনা বাস স্টপে এসে দাঁড়ালো হীরেনবাবুর দিকে পেছন ফিরে। এই লোকটির জিভ খুব খারাপ তাই এর সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

রণজয়কে সঙ্গে নেওয়ার সাহস হলো না তার।

রণজয় তার ভালো বন্ধু, কিন্তু তার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতার দিকে এগোতে পারেনি আলপনা।

বিশ্বতোষ আর শিখার দুটো কথায় দারুন আঘাত পেয়েছিল আলপনা, সে অপমান এখনো তার বুকে বাজে।

বিশ্বতোষ বলেছিল, তুমি এখন পুরোপুরি মা হয়ে গেছ, তুমি আর নারী নেই!

একটি সন্তানের জননী হলেই সে আর নারী থাকে না! সন্তানের প্রতি স্নেহ আর পুরুষের প্রতি ভালোবাসা রাখা যায় না একসঙ্গে? তার শরীরের কি মা মা গন্ধ হয়ে গেছে, আর কোনো পুরুষ পছন্দ করবে না তাকে?

আর শিখা বলেছিল, তার আকর্ষণ বেশি, তার কাছে বেশি

কিছু পায় বলেই বিশ্বতোষ তার কাছে গেছে। একটা অশিক্ষিত মেয়ে, রূপও এমন কিছু নেই, শুধু খানিকটা চটক আছে বলেই পুরুষ মানুষরা তার দিকে ছুটবে? আলপনার তুলনায় ও এমনকি বেশি দিতে পারে!

রণজয়ের সঙ্গে প্রথম প্রথম মেশার সময় আলপনার এই দুটো কথা সর্বক্ষণ মনে পড়তো। সে নিজে থেকে একটুও প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেনি রণজয়কে, রণজয়ই একটু একটু করে তার দিকে এগিয়েছে। বিশ্বতোষের তুলনায় রণজয়ের চেহারাও ভালো, গুণও যথেষ্ট। রণজয় পড়াশুনোয় ব্রিলিয়াণ্ট, বাইরের জ্ঞানও যথেষ্ট, অথচ তার স্বভাবের মধ্যে একটা ছেলেমানুষী আছে সেই জন্য তাকে আরও বেশি ভালো লাগে।

আলপনার ব্যাঙ্কে সবশুদ্ধ এগারোটি মেয়ে কাজ করে, তাদের অন্তত চারজন বেশ অ্যাকমপ্লিশড, তাদের মধ্যে দু'জন আবার আলপনার চেয়েও দেখতে শুনতে ভালো। ওদের কারুর সঙ্গে তো তেমন বন্ধুত্ব হয়নি রণজয়ের, সে আলপনার দিকেই ঝুঁকেছে। তাহলে আলপনার এখনো কিছু আকর্ষণ আছে।

রণজয়ের বিবাহিত জীবনটা দুঃখের। প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে স্ত্রী মারা যায়। ছেলেটিও তিন মাসের বেশি বাঁচে নি। সে প্রায় বছর সাতেক আগের কথা। তারপর অনেকদিন সে কারুর সঙ্গেই ভালোভাবে কথা বলতো না। ইদানীং বোধহয় আবার সংসার করার সাধ হয়েছে।

একজন বিপত্নীক, আর একজনের স্বামী থেকেও নেই। এরা পরস্পরকে পছন্দ করে। এদের মিলনে তো কোনো বাধা ছিল না। বরং আদর্শ সম্পর্ক হতে পারতো। তবু আলপনা জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। প্রথম বাধা, দুজনে এক অফিসে কাজ করে। স্বামী-স্ত্রীর একই অফিসে কাজ করার অনেক অসুবিধে। একজনকে অন্তত অন্য ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার নিতে হবে। আলপনার আর

একটা বাধ্যতার মেয়েকে নিয়ে। সে অনুভব করে যে সে সত্যিই একটু বেশি পরিমাণে জননী। যে-কোনো কথায় সে মেয়ের প্রসঙ্গ এনে ফেলে। সে জানে যে এটা উচিত নয়, অন্যরা বিরক্ত হয়, তবু সে পারে না। রণজয়ের সঙ্গে দু'একদিন গোপনে সিনেমা দেখতে গিয়েও অনবরত তার মেয়ের কথা মনে পড়েছে। তিন্নি কী করছে এখন, রান্না ঘরে গেল নাকি, হাত কেটে ফেলেনি তো?

রণজয় এমনিতে খুবই ভালো, কিন্তু তিন্নি যদি ওকে পছন্দ না করে? তিন্নি যদি বলে, আমার তো বাবা আছে, এই লোকটা কেন আমার বাবা হবে?

রণজয় আর আলপনা কেউ বিয়ের কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করে নি, দু'জনের মধ্যেই যেন একটা বোঝাপড়া আছে যে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে!

সেমন্তী বারবার বলে, তুই কি করছিস আলপনা, তুই কি মেয়ের জন্য সারা জীবন আত্মত্যাগ করবি নাকি? ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে হবে বলে নিজের জীবনের কোনো আনন্দ-উচ্ছ্বাস থাকবে না! আগেকার দিনের মা মাসিরা এরকম করতো!

আলপনা বলে, তিন্নি আর একটু বড় হোক!

—ততদিনে তোর যৌবন চলে যাবে। তুই কি তখন কোনো বুড়োর সঙ্গে প্রেম করবি! দ্যাখ না আমাকে, আমার বুঝি সন্তান নেই?

—তুই ভাই দু'দিক সামলাচ্ছিস। তোর কথা আলাদা।

—তুই বুঝি তিন্নির মা আর অন্য কারুর প্রেমিকা হতে পারিস না একসঙ্গে? হয়ে দ্যাখ তাতে বেশি মজা পাবি। তখন তিন্নিকে আরও বেশি ভালোবাসবি! রণজয়কে এত দূরে দূরে সরিয়ে রাখছিস কেন?

—এখনো সময় হয়নি!

বাড়ি ফিরে আলপনা দারুণ চমকে গেল। বিস্ময় আর আতঙ্ক

যেন একসঙ্গে আঘাত করলো তাকে।

বসবার ঘরের মেঝেতে ছড়ানো এক গাদা খেলনা। তিন্নি একটা সাইকেল চালিয়ে ঘুরছে আর হাসছে। হাততালি দিয়ে দিয়ে তিন্নিকে গান শোনাচ্ছে একজন মহিলা। শিখা নাগ।

আজ সত্যিই মিছিল ছিল, তাই ফিরতে দেরি হয়েছে আলপনার সে কিছু বলার আগেই তিন্নি বললো, মা মা, এই মাসিটা অনেকক্ষণ বসে আছে তোমার জন্য।

মাটিতে ছড়িয়ে পড়া আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শিখা বললো, আপনার বাড়িতেই চলে এলাম আলপনাদি, রাগ করবেন না।

কোনো কথা বলতে পারলো না আলপনা। তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘরে চলে গিয়ে ঝিম মেরে বসে রইলো।

প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, তবু পাশের রাস্তায় এখনো ফুটবল পিটছে পাড়ার ছেলেরা। ওদের ক্লাবে চাঁদা দেয় আলপনা, তিন্নিকে ওরা ভালোবাসে। ঐ ছেলেগুলোকে ডেকে এনে শিখাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে বাড়ি থেকে?

তাতে আরও কেলেঙ্কারি ছড়াবে। এতদিন লোকে জানত, আলপনার স্বামী অন্য জায়গায় থাকে। এখন তারা দেখবে স্বামীর সেই রক্ষিতাটিকে। আলপনার সঙ্গে শিখার তুলনা করবে লোকে আড়ালে।

শিখা বারবার আসছে কেন, কী বলতে চায় সে? এই কৌতূহলও দমন করা শক্ত।

চোখে মুখে খানিকটা জল দিয়ে নিল আলপনা। তারপর ফিরে এলো বসবার ঘরে।

শিখা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো, তিন্নির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে, দিদি। ও একদিন আমার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাবে বলেছে।

আলপনা বললো, আট বছরের কম বাচ্চাদের তো থিয়েটারে

ঢোকার তো নিয়ম নেই।

তিন্নি বললো, আমি যাবো। হ্যাঁ, আমি যাবো!

শিখা বললো, নিয়মের কী আছে? আমি ওকে গ্রীনরুমের দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবো!

তিন্নি বললো, গ্রীন রুম কী?

আলপনা বললো, নাটকের লোকেরা যে ঘরে সাজ-গোজ করে।

শিখা বললো, ঘরটার রং কিন্তু সবুজ নয়। সে ঘরে যে ঢোকে তার রঙই সবুজ হয়ে যায়। তুমি যদি যাও—

একটু বাদে আলপনা খেয়াল করলো, এই একটা বাজে স্ত্রীলোকের সামনে বসে সে এসব কথা বলছে আর শুনছে কেন? লাথি মেরে একে দূর দূর করে দেওয়া উচিত। ও তিন্নিকে আদর করছে কোন্ সাহসে?

শিখার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আলপনা। একটা অশ্লীল ছবি সে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। এই মেয়েটার শরীরে কোনো জামা কাপড় নেই, এর পাশে বিছানায় শুয়ে আছে বিশ্ব, তারও শরীরে সুতো নেই এক টুকরো, সে আদর করছে এই মেয়েটিকে। ঠিক যে-ভাবে বিশ্ব আদর করতো তাকে।

আলপনার ইচ্ছে করলো চিৎকার করে কেঁদে উঠতে।

আলপনার ভাবভঙ্গি দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল শিখা।

আলপনা বললো, তিন্নি, এবার তুমি ভেতরে যাও। পড়তে বসো। এঁর সঙ্গে আমার কাজের কথা আছে।

এই সব ব্যাপারে তিন্নি খুব বাধ্য। মা তাকে কক্ষনো বকুনি দেয় না বলে সে মায়ের সব কথা শোনে।

খেলনাগুলো গুটিয়ে নিতে নিতে তিন্নি বললো, মা, এই মাসিমা খুব ভালো। ও আগে আসেনি কেন?

শিখা বললো, আসবো। এরপর আবার আসবো।

তিনি চলে যাবার পর শিখা মুখ নিচু করে বললো, আমি এভাবে চলে এসেছি বলে নিশ্চয়ই আপনি রাগ করেছেন। কিন্তু এখানে ছাড়া অন্য কোথাও...আপনার মেয়েটি কী সুন্দর আমার এক দিদির মেয়ে ঠিক···

—আপনি আমাকে কী বলতে এসেছেন!

—বলছি। তার আগে একটু আমার নিজের কথা বলে নিই? আমার ওপর আপনার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি সব শুনলে···আমি খুব গরিবের মেয়ে, যাদবপুরের এক কলোনিতে বাড়ি ছিল, বেশি লেখাপড়া শিখতে পারিনি, ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ক্লাস নাইনে আমাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল। গরিব ঘরে মেয়ে বলে জন্মানোর যে কী জ্বালা, তা আপনি বুঝবেন না। পাড়াটাও ছিল খুব খারাপ। পয়সা রোজগারের জন্য চাকরি নিতে হয়েছিল সতেরো বছর বয়েসে। কোনো গুণ নেই, কী চাকরি পাবো। পাড়ার একজন একটা সুতো কম্পানির সেল্‌স গার্লের কাজ জুটিয়ে দিল, তার বদলে সে এখানে ওখানে নিয়ে যাবার নাম করে···

শিখার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল পড়লো মাটিতে।

আলপনার মনে হলো, ন্যাকামি! এখানেও নাটক করতে এসেছে। এরা যখন তখন চোখের জল ফেলতে পারে।

শিখা আবার বললো, আমি খারাপ মেয়ে। সবাই যাদের খারাপ মেয়ে বলে, আমি তাই। চব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অনেকে আমাকে শুষে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। কেউ আমাকে একটাও ভালো কথা বলেনি। সবাই ধরে নিত, আমি একটা খেলার জিনিস। আমি রাজি না হলে আমাকে মার খেতে হয়েছে।

আলপনা একটু উসখুস করতেই শিখা বললো, আমি সংক্ষেপে বলছি। সেল্‌স গার্লের কাজ ছেড়ে আমি অফিস থিয়েটারে

ছোট খাটো পার্ট করতাম। তাতেও অবস্থা কিছু বদলায়নি। দুর্গাপুরে একটা অফিস ক্লাবের জন্য গিয়ে…প্রথমে ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়। আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, উনি বিবাহিত কিনা তা আমি জানতাম না। উনি কিছু বলেননি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। আমি তো আর ওকে বিয়ে করার কথা ভাবিনি। আমার মতন একটা মেয়েকে ওরকম একজন মানুষ কেন বিয়ে করতে যাবেন! কিন্তু উনিই প্রথম, যিনি আমার সঙ্গে ভালো ভাবে, সম্মান দিয়ে কথা বলেছেন। ওরকম ব্যবহার আমি আগে কারুর কাছে পাইনি। আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছিল। উনিই ব্যবস্থা করে আমাকে একটা ভালো থিয়েটারে চান্স করে দেন। এ রকম একজন মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ হবো না? উনি যা বলবেন, তাই-ই আমি মানতে রাজি ছিলাম। তারপর উনি এক সময় আমার কাছে এসে, এক সঙ্গে থাকতে চাইলেন। তখন অনেকে বললো, উনি বিবাহিত, উনি বউ-মেয়েকে ছেড়ে চলে আসছেন, তখন আমি ভেবেছিলাম, আমি ছাড়বো কেন? আমি তো কোনো দোষ করিনি। আমি ছেড়ে দিলেই যে উনি ওঁর বউয়ের কাছে ফিরে যাবেন, তার কি কোনো মানে আছে? উনি হয়তো অন্য কোনো মেয়ের কাছে যাবেন। আরও একটা কথা, আমি ওঁকে ছেড়ে দিলেও বিবাহিত মেয়েরা কি আমাকে সম্মান করতো?

—এতদিন বাদে এসব কথা আমাকে বলতে এসেছেন কেন?

—আমি ঠিক ক্ষমা চাইতেও আসিনি। জানি, আমাকে ক্ষমা করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু, আমি এসেছি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে!

—আমি সাহায্য করবো? বিশ্বর কাছ থেকে আমি কোনো-দিন একটা পয়সা নিইনি। মেয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। আমি আমার বাড়ির লোকের কাছেও যাইনি। আমি কারুর

কাছে কোনো সাহায্য প্রত্যাশা করি না। কারুকে কিছু দিতেও পারবো না।

—দিদি, আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে টাকা পয়সা চাইতে আসিনি।

—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

শিখা এবার খুব করুণ, দীন গলায় বললো, আমি এক গেলাস জল খাবো!

আলপনা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, শিখার মতন একটা নোংরা, নষ্ট মেয়ে যে-জায়গাটায় বসে আছে, সে জায়গাটা ভালো করে সাবান জল দিয়ে ধুতে হবে। এখন আবার ও জল খাবে? কোন্ গেলাসে?

কিন্তু রাস্তার ভিখিরি এসে জল চাইলেও তাকে না বলা যায় না। কাজের মেয়েটিকে ডাকার বদলে আলপনা নিজেই উঠে গেল। কাজের মেয়েটির জন্য যে আলাদা গেলাস আছে, সেই গেলাসে জল ভরলো। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আলপনার এক কাপ চা খাওয়া অভ্যেস, আজ সেটা এখনো হয়নি। আলপনা ঠিক করেছিল, ঐ মেয়েটা চলে গেলে চায়ের জল চাপাবে, না হলে ওকেও চা দিতে হয়।

তিন্নির জন্য কিছু না কিছু মিষ্টি কেনা থাকেই রোজ। ফ্রিজ খুলে দুটো সন্দেশ বার করলো আলপনা। মানুষকে শুধু জল দেওয়া যায় না! তবু, সে তার জীবনের চরমতম শত্রুকে নিজের হাতে মিষ্টি খেতে দিচ্ছে, এটা ভেবেও তার গা গুলিয়ে উঠলো। ভদ্রতা রক্ষার কী জ্বালা!

শিখা বসে বসে নিঃশব্দে কেঁদে যাচ্ছে।

ধরা গলায় বললো, মিষ্টি খাবো না।

গেলাসের জলটা সে এক চুমুকে শেষ করলো। তারপর অসহায় মুখখানা তুলে বললো, উনি আর আমার কাছে থাকেন

না। গত এক মাস ধরে উনি আর একটি মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছেন !

আলপনার সমস্ত শরীরটা পাথর হয়ে গেল ।

শিখা বললো, আমি কী অপরাধ করেছি জানি না। ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়নি। গত মাসের শেষ শনিবার আমার একটা শো ছিল। আমি স্টেজ থেকেই দেখতে পেলাম, অডিটোরিয়ামের সেকেণ্ড রো-র মাঝখানে উনি অন্য একটা মেয়ের পাশে বসে আছেন, মাঝে মাঝে তার কানে কানে কী যেন বলছেন। জীবনে প্রথম সেদিন আমি পার্ট ভুল করেছি ।

দু রকম স্রোত বয়ে যাচ্ছে আলপনার মনের মধ্যে। একটা স্রোত বলছে, বেশ হয়েছে। এই মেয়েটা জব্দ হয়েছে। এবার বোঝ, অন্য একজনকে কষ্ট দিতে কেমন লাগে ! তা ছাড়া তোর মতন খারাপ মেয়েদের তো এই রকমই হয়। একজন পুরুষ চলে যাবে, তুই অন্য একজনকে ধরবি !

অন্য একটি স্রোত বলছে, বিশ্ব আবার একটা মেয়ের সর্বনাশ করবে ? এত ভদ্র, সভ্য মানুষ বলে যাকে সবাই মনে করে, সে ভেতরে ভেতরে এরকম শয়তান ? তার বেলায় বিশ্ব অভিযোগ করেছিল, সে বেশি মা-মা হয়ে গেছে। কিন্তু শিখার তো বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি, তার চেহারাও খারাপ হয়নি !

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে শিখা ব্যাকুল ভাবে বললো, দিদি, আপনি ওকে ফেরান ! আমি চলে যাবো। আমি আর জীবনে ওঁর সঙ্গে দেখা করবো না। কিন্তু আপনি ওঁকে ফিরিয়ে আনুন।

আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে বসে পড়ে আলপনা ফ্যাকাসে গলায় বললো, আমি ওকে ফিরিয়ে আনবো···কেন ?

—ও আপনার মেয়ের বাবা !

—সেটা তো আর বদলানো যাবে না। ও তিমির বাবাই

থাকবে। তিন্নি বড় হয়ে বুঝবে, ওর বাবা কী রকম।

—না, না দিদি, আপনি রাগ করে থেকে ওঁকে দূরে ঠেলে দেবেন না! উনি আমার কাছে অনেকবার বলেছেন যে, উনি নিজের থেকে বউ মেয়েকে ছেড়ে যাননি। আপনি ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

—মিথ্যে কথা!

—আপনি ঘেন্নায় বলেছিলেন, ওঁকে আর কোনোদিন ছোঁবেন না।

—হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু তার আগে

হঠাৎ আলপনা থেমে গেলো। চাঁদের উল্টো পিঠের মতন একটা অজানা দিক যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার চোখে।

সবাই জানে, বিশ্বতোষ নিজের বউ-মেয়েকে পরিত্যাগ করে এক রক্ষিতার সঙ্গে থাকে। পুরুষদের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পুরুষরা পারে, ইচ্ছে করলেই বউকে ছেড়ে তারা অন্য মেয়ের কাছে যায়। বহু বাড়িতে যে-সব মেয়েরা ঝিয়ের কাজ করে, তাদের অনেককেই স্বামী নেয় না। বিয়ের কয়েক বছর পরেই স্বামীরা তাদের ফেলে চলে যায়। এ জন্য সমাজে তাদের কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই। আলপনার বাড়িতে বেনু নামে যে মেয়েটি তিন্নির দেখা শুনো করে, তারও ঐ একই অবস্থা। বিয়ে হয়েছিল, তারপর পাত্তা নেই স্বামীর। আলপনা অনেক সময়ই ভাবতো, বেনু আর তার মধ্যে তফাৎ নেই তো কোনো।

এই প্রথম সে শুনলো, বিশ্ব মনে করে, তার স্ত্রীই তাকে পরিত্যাগ করেছে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে আলপনা তার জীবনে স্থান দিতে চায়নি।

হঠাৎ কেমন যেন একটা আনন্দ হলো আলপনার। স্বামী-পরিত্যক্তা বলে সবাই তাকে গোপনে করুণা করত, আসলে সে তো

বসে আছে গর্বের আসনে। সে কেন মুখ ফুটে বলতে পারেনি এতদিন এ কথা? নিজেই যে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এটাই তো সত্য!

এই প্রথম সে শিখার দিকে সহজ ভাবে তাকালো।

এই মেয়েটার তো গর্ব করার কিছুই নেই। খেলার পুতুলের মতন বিশ্ব ওকে কিছুদিন আদর করেছে, তারপর একটা ভাঙা পুতলের মতনই ওকে ফেলে দিয়ে আবার চলে যাচ্ছে। এ বেচারি একটা অসহায় মেয়ে। পুরুষেরা ওকে নিয়ে খেলা করে। কিন্তু আলপনা বিশ্বকে বলতে পেরেছিল, তোমার ঐ কলঙ্কিত হাতে আমাকে ছোঁবে না। আলপনা কখনো কোনো পুরুষের খেলার সামগ্রী হয়নি।

শিখা এসে এই দিকটা দেখিয়ে দিল বলে আলপনা রাগ মুছে ফেলে ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলো।

শিখা বললো, চন্দন, আমরা দুজনে একসঙ্গে সেই মেয়েটার কাছে যাই। তাকে বোঝাই। যাবেন?

উত্তর না দিয়ে শুধু চেয়ে রইলো আলপনা।

শিখা আবার বললো, আমি খোঁজ নিয়েছি, সে মেয়েটি বিবাহিতা, সিনেমায় নামতে চায়, সে এখন কিছু বুঝতে পারছে না। কিন্তু তারও জীবনটা নষ্ট হবে! আমি ঠিকানাও জোগাড় করেছি।

আলপনা দু দিকে মাথা নাড়লো। ফিসফিস করে বললো, আমি যাবো না। আমি যাবো না।

—দিদি, আপনি ঐ মেয়েটিকে বাঁচাতে চান না? ওঁকেও ফেরান। একটা সুযোগ দিন। উনি যে আপনার স্বামী! আপনি একবার ডাকলেই হয়তো উনি ফিরে আসবেন আপনার কাছে।

—মনে করো, আমি যদি কোনো পর-পুরুষের কাছে চলে

যেতাম, তিন-চার বছর বাদে ফিরে আসতে চাইলে আমার স্বামী আমাকে ফিরিয়ে নিত? মেয়েরা অপবিত্র হয়ে যায়, পুরুষরা হয় না, তাই না? নষ্ট স্বামীরা ফিরে এলেও স্ত্রীরা ধন্য হয়ে যায়, তাই না?

—তাই তো হয়, দিদি। মেয়েমানুষের স্বামীর চেয়ে বড় আর কী আছে?

—হ্যাঁ আছে। স্বামীর চেয়েও বড় হলো আত্মসম্মান! আমার একটা ভালো চাকরি আছে, তাই একথা বলতে পারছি। ভাগ্যিস আমি বিয়ের পর চাকরিটা ছাড়িনি!

—প্রীতি বলে এ মেয়েটা, সে তার স্বামীকে ছাড়বে, তারপর আবার একদিন বিপদে পড়বে।

—ওর কথা আমাকে বলো না। ওর চোখে যদি ঘোর লেগে থাকে, ও আমাদের কথা শুনবে কেন? ও ভাববে, আর দুটো মেয়েকে ছেড়ে বিশ্বর মতন একজন পুরুষ ওর কাছে ছুটে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ওর বেশি আকর্ষণ আছে!

—আমাকে কেউ ভালো করে বোঝায়নি। আমি সব কিছু জানতাম না। আমি শুনেছিলাম, আপনি ওকে কষ্ট দেন। ওঁকে বাড়িতে থাকতে দেন না, উনি একটা আশ্রয় খুঁজছেন···আপনার তুলনায় আমি কী, অতি নগণ্য।

—ওসব কথা থাক। বিশ্ব কি তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে এরই মধ্যে?

—না যায়নি। এখনো একই বাড়িতে আছি, কিন্তু ওঁর মন পড়ে থাকে ঐ মেয়েটার কাছে। এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। আমি কিছু বললে অস্বীকারও করে না।

—তাড়িয়ে দাও, এখনো সময় থাকতে তাড়িয়ে দাও। ওর জিনিসপত্র সব রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে বলো, দূর হয়ে যাও! লোকে জানুক, ও তোমাকে ছাড়েনি, তুমিই ওকে বিদায় করে দিয়েছো!

সেই মেয়েটাও জানুক।

—পারি না যে! রাগ করতে গিয়ে আমি কেঁদে ফেলি। এখনো যে আমি ওঁকে…

—তবে ভালোবেসে মর, মুখপুড়ী! ভালোবাসা কি সবাই বোঝে? তা হলে ভালোবাসা মুড়ি-মুড়কির মতন সারা পৃথিবীতে ছড়ানো থাকতো! অধিকাংশ মানুষই বোঝে না। ভালোবাসার মর্ম!

—আমিও হয়তো বুঝি না! কিন্তু আমি ঠিক করেছি, ঐ মেয়েটার কাছে কিছুতেই ওঁকে যেতে দেব না। মেয়েটার বাড়ির সামনে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকবো, সবাই দেখবে! আমি ওঁকে তিন্নির কাছে ফিরিয়ে দেবো!

—পাগলী! তা কখনো হয়। জোর করে কোনো মানুষকে ফেরানো যায়?

এই সময় তিন্নি ঘরে ঢুকে বললো, মা, দুধ খেতে দেবে না!

আলপনা প্রায় ছুটে গিয়ে তিন্নিকে কোলে তুলে নিল। আদরে আদরে ভিজিয়ে দিল তার গাল।

অদ্ভুত একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে আলপনা। আজ সন্ধে পর্যন্ত সে ছিল বিশ্বতোষের পরিত্যক্তা স্ত্রী, এখনই যেন সে স্বাধীন হলো। শিখার নাম শুনলেই তার গায়ে জ্বালা ধরে যেত, এখন এত মায়া হচ্ছে মেয়েটার ওপর!

শিখার দিকে তাকিয়ে আলপনা বললো, ভাতটা চাপিয়ে আসি। তুমি এখন যেতে পারবে না, শিখা। বসো, তিন্নির সঙ্গে গল্প করো। তুমি আজ এখানে খেয়ে যাবে!

॥ ৪ ॥

একদিন তিন্নিকে থিয়েটার রোডের এয়ার কণ্ডিশানড মার্কেটে

নিয়ে গিয়েছিল আলপনা। সেই থেকে ঐ জায়গাটা তিন্নির খুব পছন্দ। প্রায়ই বলে, মা আমি ঐ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাজারটায় যাবো!

সময় পায়না আলপনা। সকালবেলা থেকেই অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি। সারাদিন অফিস করে বাড়ি এসে আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া উত্তর কলকাতা থেকে ঐ ঠাণ্ডা বাজার অনেক দূর।

তিন্নি ছাড়বে না, তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

ফুটফুটে, নরম, উলের বলের মতন এক রত্তি একটা মেয়ে, তবু এর মধ্যেই বেশ জেদী হয়েছে।

শিশু-পালন বিষয়ে যে-কোনো প্রবন্ধ দেখলেই মন দিয়ে পড়ে আলপনা। আজকাল নানারকম পত্র পত্রিকা, তাতে রূপ চর্চা, দাম্পত্য সম্পর্ক, বাচ্চা মানুষ করা ইত্যাদি নিয়ে লেখা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায়ই বেরোয়।

ভাঙা পরিবারের সংখ্যাও এখন কম নয়।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর বাচ্চারা সাধারণত মায়ের কাছেই থাকে। যে বাচ্চারা বাবাকে কাছাকাছি পায় না, তারা নাকি জেদী হয়ে যায়। মায়ের দুর্বলতা বুঝে মায়ের ওপর বেশি আবদার করে, কিছু চেয়ে না পেলে বুকের মধ্যে সাংঘাতিক অভিমান জমে যায়।

আলপনা জানে যে সে তিন্নিকে বেশি আদর আর প্রশ্রয় দেয়। বুঝেও সে নিজেকে সংযত করতে পারে না। মেয়ে একটু অভিমান করে ঠোঁট ফোলালেই যেন বুকটা গুঁড়িয়ে যায় আলপনার।

জন্মের পর তিন্নিকে নিয়ে কত আদিখ্যেতা করতো বিশ্ব, এখন মাসে একবার তিন্নিকে কিছু খেলনা কিনে দিয়েই সে তার দায়িত্ব শেষ করে। তিন্নিকে তার বাবা-মা দুজনের স্নেহ যে আলপনাকে একলা দিতে হয়।

সারা ভারতের ব্যাঙ্ক স্ট্রাইক, তাই সপ্তাহের মাঝখানে হঠাৎ সেদিন ছুটি পাওয়া গেল।

মিছিলে টিছিলে যায় না আলপনা, স্ট্রাইকের দিনটা তার সত্যিই ছুটি।

আজকের দিনটায় আলপনা ঘর গুছোবে ঠিক করেছিল। ছোট্ট একটা সংসার, মাত্র দুখানা ঘর, তবু সব কিছু অগোছালো মনে হয় তার।

বেলা এগারোটার সময় হঠাৎ রণজয় এসে উপস্থিত। তাও এলো বেশ সাড়ম্বরে।

রাস্তায় কী একটা গোলমাল শুনে আলপনা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, পাড়ার ছেলেরা রাস্তার মাঝখানে ইঁট সাজিয়ে উইকেট বানিয়ে ক্রিকেট খেলছিল, একটা গাড়ি এসে সেই উইকেট ভেঙে দিয়েছে। ছেলেরা ঘিরে ধরেছে গাড়িটা। দরজা খুলে যে নামলো, তাকে দেখে আলপনার বুকটা ধক করে উঠলো। রণজয়।

রণজয়কে আগে কখনো গাড়ি চালাতে দেখে নি আলপনা, রণজয়ের যে গাড়ি আছে, তাও সে জানে না। কিন্তু এখন সে সব কথা মনে পড়লো না। সে ভাবলো, রণজয়কে ওরা মারবে নাকি?

পাড়ার ছেলেরা আলপনাকে মানে। আলপনা ছুটে যাবে কিনা চিন্তা করতে করতেই রণজয়ের কী একটা কথায় হো-হো করে হেসে উঠলো ছেলেরা।

আলপনা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো!

গাড়িটা আবার ব্যাক করে আলপনাদের বাড়ির দরজার সামনে এনে বীরের মতন ভঙ্গিতে নামলো, রণজয়।

দরজা খুলেই আলপনা জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছিল?

এক গাল হেসে রণজয় বললো, কিচ্ছু না! আজ ছুটির দিনে কী প্ল্যান? কোথাও ঘুরে আসবে?

ভেতরে এসে সে জিজ্ঞেস করলো, তিমি দেবী, আজ বেড়াতে

যাবে ? কী সুন্দর, মেঘলা মেঘলা দিন।

আলপনার মতামতের আর কোনো মূল্য রইলো না।

তিন্নি বেড়াবার নামে নেচে উঠলো। তিন্নির ইস্কুল এখন পাঁচ দিন ছুটি।

আলপনা বললো, ঐ গাড়িটা তোমার ?

রণজয় লাজুক হেসে বললো, ওটা আমার বাবার আমলের গাড়ি। অফিসে নিয়ে যাই না। আমার ব্যাঙ্কের আর কারুর গাড়ি নেই, আমার একলা গাড়িতে যাওয়া ভালো দেখায় না। গাড়িটা পুরোনো হলে কী হবে, দারুণ হার্ডি, একেবারে পংখীরাজ।

আলপনা বললো, গাড়িটা না হয় ভালো বুঝলুম। কিন্তু ড্রাইভারের ওপর কি ভরসা করা যায় ? ছেলেদের উইকেট ভেঙে দিলে।

রণজয় আজ বেশ হালকা মেজাজে আছে ? সে বললো, একটা গান আছে জানো, পূর্ণ দাসের···মাঝিগিরি জানি ভালো, ভয় করো না ব্রজাঙ্গনা···আমার হোক না কেন জীর্ণ তরী, কর্ণধারের গুণ জানো না···

তিন্নির এসব শোনার ধৈর্য নেই, সে নেচে নেচে বলতে লাগলো, চলো, চলো···

তিন্নিকে তৈরি করাবার কিছু নেই, একটু আগেই তাকে স্নান করিয়ে ভালো জামা পরানো হয়েছে। আলপনা গেল বাথরুমে।

ফিরে এসে দেখলো, রণজয় আর তিন্নি দু'জনে দু'জনের আঙুল ধরে ধরে কী একটা খেলা খেলছে। তিন্নি উঠে বসেছে রণজয়ের কোলে।

একটা ভালো লাগার স্রোত শরীরে অনুভব করে আলপনা। তিন্নির সঙ্গে যদি রণজয়ের ভাব হয়ে যায়, তার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই।

অফিসে সাধারণত চুপচাপ থাকে রণজয়, কিন্তু এখন সে বেশ উচ্ছল, ছোটদের সঙ্গেও মিশতে পারে সহজে।

আলপনা জিজ্ঞেস করলো, তুমি পাড়ার ছেলেদের তখন কী বললে?

রণজয় বললো, সে কিছু না? তোমার শোনার দরকার নেই।

গাড়ি নিয়ে বেরুবার সময় ছেলেরা ক্রিকেট খেলা থামিয়ে হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আলপনা আবার জিজ্ঞেস করলো, বলো না, এরা কেন হেসে উঠলো?

রণজয় বললো, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে কিছু গোলমাল হলে রাগারাগি না করে সারেণ্ডার করাই ভালো। ওদের উইকেট ভেঙ্গে দিলে তো ওরা রেগে যাবেই। রাস্তায় খেলার অধিকার আছে, যথেষ্ট খেলার মাঠ নেই কেন? একজন ছেলে আমাকে প্রায় টেনে নামাতে যাচ্ছিল, তখন আমি বললুম, হ্যাঁ ভাই, আমার দোষ হয়ে গেছে। আমাকে যদি মারতে হয় অন্য গলিতে নিয়ে গিয়ে মারো। এখানে ঐ বাড়ির আলপনাদি দেখে ফেললে আমি বড্ড লজ্জা পাবো!

—তুমি বললে, আলপনাদি?

—হ্যাঁ। মেয়েদের দিদি বললেই সাত খুন মাপ।

একটু বাদে আলপনা বললো, কোথায় বেড়াতে যাবে? একবার এয়ার কণ্ডিশান্ড মার্কেটে নিয়ে যাবে আমাদের?

রণজয় বললো, কেন, খুব জরুরি কেনাকাটি আছে বুঝি!

আলপনা তিন্নির দিকে তাকালো।

তিন্নি গম্ভীর ভাবে বললো, আমার ইস্কুলের জন্য সাদা মোজা কিনতে হবে।

রণজয় বললো, ও তাই তো? সাদা মোজা তো পৃথিবীর আর কোনো বাজারে পাওয়া যায়! তা হলে ওখানে যেতেই হবে।

গাড়ির সামনের সীটেই বসেছে তিনজনে।

রণজয় তিন্নির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে বললো, ঠিক আছে, আগে আমরা বাজার করবো, তারপর চিড়িয়াখানার ভেতরে একটা রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে আমরা খাবো। হরিণ ডাকবে, সিংহ ডাকবে, সেই সব শুনতে শুনতে আমরা আইসক্রিম খাবো।

আজ সাড়ে চার বছরের মেয়ে তিন্নিই নায়িকা। সব কিছুই তার জন্য। মা ছাড়া অন্য কারুর কাছ থেকে তিন্নি অনেকদিন এমন আদর পায় নি।

এয়ার কণ্ডিশানড মার্কেটে কিছু কেনাকাটি করার পর ওরা বেরুলো এক ঘণ্টা বাদে।

তিন্নি রণজয়ের হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে, আলপনা পেছনে।

এই সময় কেউ একজন ডাকলো, তিন্নি!

ঠিক যেন বজ্রপাত হলো।

লর্ড সিন্‌হা রোড থেকে সোজা থিয়েটার রোড পার হয়ে একেবারে ওদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব।

বিশ্ব বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দেয়নি, স্বাভাবিক গলাতেই ডেকেছে, কিন্তু আলপনার কানে শোনালো অন্যরকম। বিশ্ব প্রথমে আলপনাকে দেখতেই পায় নি, সে দেখেছে একজন অচেনা মানুষের হাত ধরে তিন্নিকে লাফাতে।

ঐটুকু বাচ্চা তিন্নির যেন কিছু হয়েছে। সে আড়ষ্ট গলায় বললো, বাবা?

বিশ্ব এবার আলপনাকে দেখলো, রণজয়ের মুখের দিকে তাকালো।

কেনাকাটির কয়েকটি প্যাকেট বইছে রণজয়, দু'একটা আলপনার হাতে, তিন্নির হাতে চকোলেট বার। ঠিক যেন একটা

সুখী পারিবারিক ছাঁচ।

বিবাহ বিচ্ছিন্না কোনো মহিলা তার সন্তান ও প্রেমিকের সঙ্গে হাসাহাসি করে যেতে যেতে হঠাৎ যদি তার প্রাক্তন স্বামীকে দেখতে পায়, তখন তার কী রকম ব্যবহার করা উচিত, পত্র-পত্রিকার বিশেষজ্ঞদের প্রবন্ধে সে সম্পর্কে কিছু লেখা থাকে না। আলপনা নির্বাক পাথর হয়ে গেল।

বিশ্ব চট করে মুখে হাসি এনে বললো, নমস্কার। আপনি নিশ্চয়ই রণজয় সোম? আলপনার ব্যাঙ্কে কাজ করেন? আমি তিন্নির বাবা।

পুরুষেরা প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে প্রথমেই তলোয়ার বার করে না। প্রথম যুদ্ধ শুরু হয় চোখে চোখে।

রণজয় বিশ্বর চোখে সেরকম কোনো যুদ্ধের ইঙ্গিত দেখতে পেল না।

সেও হাসি মুখে বললো, নমস্কার।

ভদ্রতা বিশ্বর চরিত্রের অঙ্গ। কোনো ভদ্রলোক রাস্তার মাঝখানে নাটক করে না। তারা নাটক জিনিসটা রঙ্গমঞ্চেই উপভোগ করে।

বিশ্ব আলপনার দিকে তাকিয়ে বললো, কেমন আছো, আলপনা।

আলপনা কোনো উত্তর দিতে পারলো না। এতদিন পর দেখা। এই মানুষটা এক সময় তার সবচেয়ে আপন ছিল, এখন যেন তাকে সে চিনতেই পারছে না।

বিশ্ব এবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কোথায় যাচ্ছো? আজ ছুটি নাকি? ও, আজ তো ব্যাঙ্ক স্ট্রাইক।

তিন্নি বললো, বাবা, আমরা চিড়িয়াখানায় যেতে যাচ্ছি। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

কোনো শিশুর পক্ষেই এরকম কথা বলা সম্ভব। এক হিসেবে এই প্রস্তাবটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক।

বিশ্ব এবার হুট করে আলপনা আর রণজয়ের মুখে চোখ বুলিয়ে নিল। আলপনা এখনো পাথর, রণজয় বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত।

বিশ্ব তিন্নিকে বললো না রে, কী করে যাবো। আমার তো আজ ছুটি না। এখানে একটা কাজে যাচ্ছি!

তিন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে হামি দিল বিশ্ব।

তারপর আলপনা ও রণজয়ের দিকে আরেকবার চেয়ে, এই প্রথম ঈষৎ ঠেস মারা সুরে বললো, আপনারা খাওয়া দাওয়া করুন। আমাকে এক্ষুণি কাজে ছুটতে হবে!

তিন্নিকে কোল থেকে নামিয়ে বিশ্ব বললো, এই রবিবার তো আসছিস—

কথাটা শেষ না করেই হনহন করে এগিয়ে গেল বিশ্ব।

এই মুহূর্তে যদি কোনো নিরপেক্ষ বিচারক থাকতো, তা হলে এই দৃশ্যটায় বিশ্বকেই বেশি নম্বর দিত। তার ব্যবহার ত্রুটিহীন।

এরপর চিড়িয়াখানায় খাওয়া দাওয়া আর জমলো না।

ছোটদের মনটা জলের মতন, তাতে কোনো দাগ পড়ে না। তিন্নি সব ভুলে গিয়ে চিড়িয়ানায় ঢুকে হৈ চৈ করতে লাগলো বটে, কিন্তু রণজয় আর আলপনা দু'জনেই যেন অসার।

তিন্নির টানাটানিতে রণজয় এক সময় তাকে নিয়ে গেল সাদা বাঘের খাঁচার কাছে, আলপনা আর একটু দূরে বসে নিঃশব্দে কাঁদলো খানিকক্ষণ। কেন কাঁদছে তা সে জানেনা অবশ্য।

মাসে একবার সিঁথিতে বিশ্বদের বাড়িতে তিন্নিকে পেঁছে দিতে হয়। শুধু কাজের মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়েও ভরসা পায় না

আলপনা। সেও যায়। গলির মোড়ে এসে বেনুকে বলে, ফেরার সময় তুই এখানে এসে দাঁড়াবি। আমি ঠিক পে'ছে যাবো।

মাঝখানের প্রায় দু'ঘণ্টা সময় সে সেমন্তীর বাড়িতে কাটিয়ে আসে।

প্রথম প্রথম তিন্নি বলতো, মা, তুমি বাবার কাছে যাবে না কেন?

এখন সে বুঝে গেছে। সে জানে, কোনো একটা দুর্বোধ্য কারণে বাবা আর মা কথা বলে না।

এই রবিবারে বেনুর হাত ধরে তিন্নি চলে গেল গলির মোড় থেকে।

আলপনা একটা ট্যাক্সির জন্য বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই দেখলো একটা ট্যাক্সি থেকে নামছে বিশ্ব।

স্ত্রীকে ছেড়ে একজন রক্ষিতার সঙ্গে থাকাটা বিশ্বর বাবা কী ভাবে নিয়েছেন, তা জানে না আলপনা। বিশ্বর বাবাও তো তার খোঁজ করেন নি কোনোদিন। বাবাকে বিশ্ব কী বুঝিয়েছে তা সে-ই জানে! আলপনা শুধু এইটুকু জানে যে, রবিবারগুলো অন্তত বিশ্ব সকাল থেকে এখানেই কাটায়।

এখন তাও থাকে না বোধহয়। বিকেলবেলা সে ট্যাক্সিতে অন্য কোনো জায়গা থেকে তাড়াহুড়ো করে ফিরছে।

বিশ্ব যে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছে, সেটা ধরতে গেলে এখুনি ছুটে যেতে হয়। কেননা আরও দু'জন লোক ঐ ট্যাক্সি নেবার জন্য আসছে দু'দিক থেকে।

কিন্তু আলপনা সে ভাবে ট্যাক্সি ধরতে পারবে না। রবিবার বিকেলেও এই সব জায়গায় সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, না পাওয়া যাক, আলপনা বাসে যাবে।

বিশ্ব মুখ ফিরিয়ে আলপনাকে দেখতে পেল।

অন্য লোক দুটিকে সে বললো, দুঃখিত, এ ট্যাক্সি এখন ছাড়া

হচ্ছে না।

তারপর সে আলপনার কাছে এসে স্বাভাবিক গলায় বললো, তুমি ট্যাক্সি খুঁজছো তো, এটাতে উঠে পড়ো।

সেই এক সকালে গৃহত্যাগ করার পর বিশ্বর সঙ্গে সরাসরি একটা কথাও বলে নি আলপনা। আগের দিনও কথা হয় নি। আজও বললো না। এখানে প্রত্যেকবার আসতেই তার অপমান লাগে। বিশ্বর কথার প্রতিবাদ করতেও তার রুচিতে বাধলো।

নিঃশব্দে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো আলপনা।

ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিতেই দরজা খুলে আলপনার পাশে এসে বসলো বিশ্ব।

আলপনা মুখ তুলে তাকাতেই দেখল বিশ্বর একটা অন্যরকম মুখ।

এটা রাস্তা নয়, এখানে অন্য কেউ দেখবে না, এখানে ভদ্রতার আচরণ সরিয়ে হৃদয় খুলে দেখানো যায়।

বিশ্ব হঠাৎ হাহাকারের সুরে চেঁচিয়ে বললো, তুমি কি করছো আলপনা? তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

সেই স্বরের অভিমানে আলপনা খানিকটা কুঁকড়ে গেল। তবু কোনো কথা বলতে পারলো না।

বিশ্ব আবার বললো, আমার মেয়ে, আমার নিজের মেয়ে, সে অন্য একজন লোকের হাত ধরে হাঁটছে, যেন ঐ লোকটাই আমার মেয়ের বাবা, এটা দেখলে আমার বুক ফেটে যায়, তা তুমি বোঝো না?

আলপনার চোখ ঝক ঝক করে উঠলো।

সে বলতে চাইলো, যদি শিখার একটা সন্তান হতো, সেই বাচ্চাটিকে তুমি কোলে নিয়ে আদর করতে, তা দেখে আমার কী রকম লাগতো?

এ কথাও আলপনার মুখ ফুটে বেরুলো না, সে চুপ করে

রইল। পুরুষ মানুষের চোখ দিয়ে সহজে জল বেরোয় না। বিশ্বর গলা ভেঙে এসেছিল। সে একটুক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে থেকে নিজেকে সামলে নিল।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, শিখা তোমার কাছে এসেছিল। সে তোমাকে কী বলেছে জানি না, যা বলেছে সব বাজে কথা!

শিখা এর মধ্যে বার তিনেক এসেছে বাড়িতে। তাকে পছন্দ করেছে আলপনা। ও একটা বিমূঢ় মেয়ে।

আলপনা এবার অতিকষ্টে বললো, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না!

বিশ্ব গর্জন করে বলে উঠলো, হ্যাঁ, তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার এত অহংকার কিসের? আমি তোমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেছি?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না।

বিশ্ব আবার বললো, তোমরা মেয়েরা এক একটা হিংসের ডিপো! অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু হেসে গল্প করলেই তোমাদের বুক জ্বলে যায়! তুমি যখন আমার জন্য একটুও সময় দিতে না, তখন আমি একটা মেয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম বলেই তোমার ঐ টেলিফোনের বান্ধবীটা সাত কাহন করে লাগিয়েছিল! কিন্তু সে যে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করে, তার বেলা কি? তাকে তুমি ত্যাগ করেছো? বান্ধবীকে ত্যাগ করতে পারো না, আর স্বামীর ওপর যত চোটপাট?

আলপনা বললো, এসব কথা এখন আলোচনা করে কী লাভ?

—শিখা তোমাকে কী বলেছে আমি জানি।

—আমি এই ট্যাক্সি থেকে নেমে যাবো?

—না, তোমাকে শুনতেই হবে। শিখা বাজে কথা বলেছে।

প্রীতি একটা বিবাহিতা মেয়ে, তার দুটো সন্তান আছে, তার সংসারটা আমি নষ্ট করবো, আমি কি এত বাজে লোক? আমি কি পাগল? প্রীতির সঙ্গে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে এমনিই একটু কথা বলছিলাম, তাতেই শিখার কী রাগ! প্রীতিকে নিয়ে আমি থিয়েটার দেখছিলাম, সেদিন প্রীতির পাশে যে তার স্বামী বসেছিল, তা শিখা কিছুতেই বিশ্বাস করে না।

—ট্যাক্সি রোককে।

—নেহি, আপ চলিয়ে! তোমাকে তোমার বান্ধবীর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি, তার আগে এই সব কথা তোমাকে শুনতেই হবে। শিখার এই রকম বাড়াবাড়ি দেখে প্রীতি আরও মজা পেয়ে গেছে। সে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ভান দেখিয়ে শিখাকে আরও রাগাচ্ছে। প্রীতির আরও একটা মতলব আমি টের পেয়েছি। মেয়েরা কত পিকিউলিয়ার হয়। প্রীতির স্বামীটা কোনো কিছুতেই রাগ করে না। তার স্ত্রী অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে প্রেম করলেও তার হুঁস বোধ নেই। এই স্বামীর মনে ঈর্ষা জাগাবার জন্যই প্রীতি আমার সঙ্গে বেশি বেশি মেলামেশা করতে চাইছিল। আমি একটা উপলক্ষ মাত্র। এটা বুঝতে পেরেই আমি প্রীতির কাছ থেকে সরে এসেছি। আলপনা, তুমি বিশ্বাস করো, ওর সঙ্গে আমার কোনোদিন সীরিয়াসলি কোনো সম্পর্ক হয় নি?

—তাই বুঝি!

—তুমি বিশ্বাস করছো না এখনো?

—তোমার সঙ্গে কয়েক বছর আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে প্রীতি আসছে কোথা থেকে। তাকে আমি চিনি না!

বিশ্ব এবার ফস করে আলপনার একটা হাত ধরে আন্তরিক গাঢ় স্বরে বললো, তুমি জানো না, আমি কত ক্লান্ত! তুমি আমাকে ফিরতে দাও। আমাকে তিন্নির বাবার জায়গাটা নিতে দাও!

আলপনা এতক্ষণে তার রাগ-অভিমানকে সংযত করতে পেরেছে।

সে শান্ত গলায় বললো, তিমির বাবা তুমি থাকবে চিরকাল। তা তো অস্বীকার করা যাবে না। তবে তুমি যদি কোথাও ফিরতে চাও, তা হলে শিখার কাছে ফিরে যাও। সে বেচারি···

—শিখার কাছে, না, না। শিখা তো

—শিখাই তোমাকে ভালোবাসে ও একটা অসহায়, খাঁটি মেয়ে। ও তোমার জন্য···

—শিখার জন্য তুমি বলছ আলপনা? আমি যে তোমারই কাছে···

—আমি তো তোমাকে আর ভালোবাসি না, বিশ্ব! পুরোনো কথা তুলে আর কোনো লাভ নেই। আমি আমার মনটা বুঝে গেছি।তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও! তোমার ছোঁয়া আমার অসহ্য লাগছে। আর কোনোদিন আমি তোমার ছোঁয়া সহ্য করতে পারবো না।

বিশ্ব তীব্র চোখে তাকালো। আলপনা চোখ নামিয়ে নিল না। সে সোজা তাকিয়ে রইলো বিশ্বর দিকে। এবার বিশ্বর মুখে হাসি নেই, কিন্তু আলপনা মুখ টিপে টিপে হাসছে।

॥ ৫ ॥

নাটকের শেষ দৃশ্যটা বেশ লম্বা, তাতে শিখার কোনো ভূমিকা নেই, আগেই তার মৃত্যু ঘটে গেছে। গ্রীণ রুমে বসে মেক আপ তুলছে শিখা।

মেয়েদের গ্রীণ রুমে কেউ নেই। এ সময় আয়নার সামনে যত খুশী মুখ ভ্যাঙচানো যায়। নাকের কাছে একটা ফুস্কুরি উঠেছে। অনেকটা ক্রিম দিয়ে ঢাকতে হয়েছিলো সেটাকে।

শিখার মুখে প্রায়ই এরকম ফুস্কুরি হয়।

শিখা নারকোল তেল হাতে মেখে ঘষছে, একটু জ্বালা করছে। শিখা সারাজীবন তার বাবার মুখ ভর্তি ব্রণো দেখেছে, সেই ধারাটা পেয়েছে সে।

হঠাৎ মনে পড়ায় অর্ধেক মেক আপ তোলা অবস্থায় ঘরের মধ্যে পা মেপে মেপে হাঁটতে লাগলো।

বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ, শিখার ভূমিকা একটি রাশিয়ান যুবতীর। তার গলার রেইঞ্জ ভালো, অভিনয় উৎরে যায়, কিন্তু পরিচালক বলেন, তার হাঁটাটা ঠিক হয় না। বাঙালী বাঙালী মনে হয়। যাদবপুর কলোনির গরিবের মেয়ে শিখা, সে আবার কবে মেম সাহেবদের হাঁটা দেখেছে? দেখেছে শুধু সিনেমায়। তবু হাঁটাটা ঠিক করতে হবে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো একজন মহিলা। শিখার চেয়ে বয়েসে কিছুটা বড়। একটা কালো সিল্কের শাড়ি পরা, তার ফর্সা রঙে বেশ মানিয়েছে। তবে তার ঠোঁটের রং মনে হচ্চে অতিরিক্ত লাল যেন এই মাত্র রক্ত খেয়ে এলো।

মহিলাটি বললো, নমস্কার!

শিখার দু'হাতে তেল মাখা, সেই অবস্থাতেই সে হাত জোড় করলো।

মহিলাটিকে সে চিনতে পেরেছে, এরই নাম প্রীতি, বিশ্বর নতুন বান্ধবী। এর আগে দু'বার নাটকটা দেখে গেছে, তবু আশ মেটে নি? এমন কী আছে এই নাটকে?

যে-সব মেয়েদের দেখলেই বোঝা যায় সচ্ছল, ধনী পরিবারের, তাদের সঙ্গে কথা বলতে আজও আড়ষ্ট বোধ করে শিখা। যেন ঐ সব মেয়েরা অন্তর্ভেদী চোখ দিয়ে দেখে ফেলে তার অতীতটা।

প্রীতি বললো, আপনাকে কংগ্রাচুলেশানস জানাতে এলাম।

আপনার অভিনয় সত্যিই অপূর্ব !

এটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু বলার আগে নিছক একটা কথার কথা। পুরো নাটক না দেখেই উঠে এসে এরকম ভাবে প্রশংসা জানানো অস্বাভাবিক ! প্রীতি বিশ্বকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। শুধু তাই-ই নয়, সামনা সামনি এসে দেখিয়ে দিতে চায়, শিখা তার তুলনায় কত ছোট, কত অযোগ্য !

শিখা শুধু বললো, আপনি সবটা দেখলেন না ?

প্রীতি বললো, আগে তো দেখেছি। সত্যি কথা বলছি ভাই, আপনি সেকেন্ড অ্যাক্টে বেরিয়ে আসার পর নাটকটা কেমন যেন ঝুলে যায়। এখানে খাবার জল আছে ?

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেউ এখানকার জল খায় না। প্রত্যেক্যেই নিজস্ব জলের বোতল নিয়ে আসে।

শিখার নিজের ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বার করে দিল।

প্রীতি বললো, গেলাস লাগবে না।

আলগোছে এক ঢোক জল খেয়ে বললো, এখন যে-কটা নাটক হচ্ছে, সব কটা আমার দেখা। দেখা হলেও আবার আমি দেখি। থিয়েটারের পরিবেশ আমার খুব ভাল লাগে।

একটু হেসে আবার বললো, তা বলে আমার কিন্তু কোনো দিন স্টেজে অভিনয় করতে ইচ্ছে হয় নি। সে ক্ষমতা নেই। এমনিই. জীবনটা খুব সাদা মাটা কিনা, তাই দেখতে ভালো লাগে নাটক।

এ কথার কী উত্তর দেবে শিখা ? সে চুপ করে রইলো।

—আপনি ছোটবেলা থেকে অভিনয় করেন ?

—না। মাত্র চার পাঁচ বছর।

—কী করে নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন ? বাড়িতে অন্য কেউ···

—না। পয়সার জন্য। আগে অফিস ক্লাবের থিয়েটার

করতাম। এখন এখানে চান্স পেয়েছি।

—বিশ্ববাবু নাটক ভালবাসেন। আমাকে খুব কয়ে ধরেছিলেন, এই গ্রুপের পরের নাটকে একটা রোল করবার জন্য। আমি বলেছি, ওরে বাবা রক্ষে করো। আমার দ্বারা ওসব হবে না। বাড়িতে দুটো ছেলে মেয়ে আছে।

—ছেলেমেয়ে থাকলেও অনেকে অভিনয় করে।

—আমার ইণ্টারেস্টই নেই। নাটক দেখতে ভালো লাগতো, তাও আর দেখা হবে না। আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না ভাই।

—কেন ?

—চলে যাচ্ছি যে! আমার স্বামী অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। ওখানে বাংলা নাটক দেখা তো দূরের কথা, বাংলায় কথা বলার লোক পাবো কি না সন্দেহ!

—আপনি চলে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ ভাই। আপনাকে একটা জিনিস দিলে আপনি নেবেন ? আমার খুব ইচ্ছে এটা আপনাকে দিই। আপনার অভিনয় ভালো লেগেছে।

হাত ব্যাগ খুলে একটা মুক্তোর মালা বার করলো প্রীতি।

আলোয় ঝক ঝক করে উঠলো তার ভেতরের আভা। শিখার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। এসব কী হচ্ছে? বিশ্বর সঙ্গে প্রীতিকে যেদিন প্রথম দেখেছিল শিখা, সেদিন প্রীতির গলায় ছিল এই মালাটা।

শিখা কুঁকড়ে সরে গিয়ে বললো, না, না, না, এত দামি মালা আমি নেবো কেন ?

প্রীতি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, আসল মুক্তো নয়। দেখছেন না, বেশি চকচক করছে। কসটিউম জুয়েলারি, দাম বেশি না। আমি তো বিদেশে যাচ্ছি, আবার কিনে নিতে পারবো।

এটা আপনি নিন প্লীজ !

শিখা আরও প্রতিবাদ করলেও কিছুতেই শুনলো না প্রীতি। প্রায় জোর করে মালাটা পরিয়ে দিল শিখার গলায়।

তারপর বললো, এটা আপনাকে সুন্দর মানিয়েছে। আমার চেয়েও ভালো মানিয়েছে।

প্রগাঢ় আন্তরিকতার সঙ্গে শিখার একটা হাত ধরে চাপ দিয়ে বললো, যাই ! আবার কবে এ দেশে ফিরবো তার ঠিক নেই !

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎ বেরিয়ে গেল প্রীতি।

বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ আয়নার সামনে বসে রইলো শিখা। ঐ মহিলাটি তাকে নিয়ে একটা খেলা খেলে গেল। কী সেই খেলা ?

মালাটা গলা থেকে খুলে নিল শিখা। একবার ইচ্ছে হলো ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

কিন্তু এখানে ফেলে দিলেও অন্য কেউ তুলে নেবে। আসল মুক্তো না হলেও যে খুব কম দামী নয়, তা দেখলেই বোঝ যায়।

শিখা এই মালাটা গলায় দিয়ে থাকলে বিশ্ব নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। অনেক পুরুষ কিছু লক্ষ্য করে না, কিন্তু বিশ্ব মেয়েদের শাড়ি গয়নার প্রতি বেশ নজর রাখে।

তবে কি বিশ্বই এই মালাটা কিনে দিয়েছিল প্রীতিকে ? সেই জন্য শিখাকেই ফেরৎ দিয়ে গেল ? এইভাবে প্রত্যাখ্যান জানাচ্ছে বিশ্বকে ?

এইবার শিখা বুঝতে পারলো, কেন এসেছিল প্রীতি।

সে যে অনেক দিনের জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছে, সেটা জানানোই আসল কথা। মালাটা একটা প্রতীক। প্রীতি যেন আরও বলে গেল শিখাকে, বিশ্ব নামে ঐ পুরুষটাকে আর আমি চাই না। তোমার বিশ্বকে তুমি ফেরৎ নাও।

মহিলাটির এত দয়া ! নাকি এত ভালো চাকরি করা স্বামীকে

তিনি শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারলেন না ?

এই মালাটা দেখে বিশ্বর কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখার কৌতূহলেই শিখা মালাটা রেখে দিল নিজের ব্যাগে।

তারপর হুড়মুড়িয়ে অন্য মেয়েরা ঢুকে এলো এই ঘরে। নাটক শেষ।

প্রথম প্রথম কার কী ভুল হয়েছে, কে ডায়ালগ ছাড় দিয়েছে, কে কিউ ধরতে পারে নি, তা নিয়ে অনেক হাসাহাসি আর কলরব হতো। এখন তেত্রিশ নাইট হয়ে গেছে, এখন সব কিছুই রুটিনের মতন।

আগে এখান থেকে বেরিয়ে কয়েকজন মিলে কোথাও খেতে যাওয়া হতো। এখন যে-যার বাড়ি ফিরে যায়।

আগে বিশ্ব এই সময় প্রত্যেকদিন উঁকি দিত গ্রীণ রুমে। শিখাকে সে সঙ্গে নিয়ে যেত। রেস্তোরাঁয় অনেকে মিলে খাওয়া দাওয়ার খরচ বিশ্বই দিত সবটা। এখন আর বিশ্ব আসে না। প্রীতি চলে গেছে, তা হলে কি সে অন্য ফুলের সন্ধান পেয়েছে ?

বিশ্ব এখনো থাকে শিখার সঙ্গেই। শিখার বান্ধবীটি চলে গেছে, দুটো ঘরই এখন ওদের। বিশ্ব আর শিখা এক বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু এক ঘরে শোয় না। কথাবার্তাও প্রায় বন্ধ। শিখা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় নি, তার কারণ তার আর অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই। বাপের বাড়ির দরজা তার কাছে বন্ধ।

বিশ্ব কেন এখনো এখানে পড়ে আছে, তা সে-ই জানে। তার নিজের বাড়ি রয়েছে সিঁথিতে, তা ছাড়াও ইচ্ছে করলেই সে অন্য ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে পারে। তার পয়সার অভাব নেই।

শিখার আগেই মেক আপ তোলা হয়ে গেছে, সে বেরিয়ে পড়লো।

এই সময় মিনি বাস ফাঁকা পাওয়া যায়। এখনো রাস্তায়

অনেক লোকজন আছে, বেশি রাত হয়ে গেলে একা দাঁড়াতে ভয় করে। রাত্তিরবেলা ময়দানে ঘোরাফেরা করে অনেক জন্তু-জানোয়ার।

গাছের ছায়া থেকে একজন বেরিয়ে এসে ডাকলো, ছোড়দি!

শিখা ঘুরে দাঁড়ালো, ছোটভাই মনিকে দেখে তার প্রথমেই মনে পড়লো, ভাগ্যিস তার ব্যাগে কিছু টাকা আছে আজ।

নিম্ন মধ্যবিত্তদের অদ্ভুত নীতি বোধ! ইস্কুলের পড়াশুনো ছাড়িয়ে তার বাবা তাকে একটা চাকরি নিতে বাধ্য করেছিল। নামেই চাকরি, কমিশনের সেল্স গার্ল, একজনের দয়ায় জুটেছিল, সেই দয়ার বিনিময়ে সে শিখার শরীর ছানাছানি করতো, শিখাকে নিয়ে যেত ডায়মণ্ডহারবারে। বাড়িতে সেটা অজানা ছিল না, তবু তো সেটা চাকরি, সবাই জানে, মেয়ে চাকরি করতে যায়, সেটাই যথেষ্ট। শিখা যেই থিয়েটার করতে শুরু করলো, অমনি তার বাবা অগ্নিমূর্তি ধরলেন। এমনকি নিজের মেয়েকে খানকী বলে গালাগালি দিতেও তার মুখে আটকায় নি।

তবু ছোট ভাইটা এসে এখন প্রায়ই টাকা নিয়ে যায়। গোপনে।

—মা কেমন আছে রে, মনি?

—ভালো না। শরীর খুব খারাপ, ডাক্তার অনেক ওষুধ খেতে বলেছে, কিন্তু ওষুধের যা দাম।

প্রায় প্রত্যেকবারই এরকম কথা বলে। সে জানে মায়ের সম্পর্কে শিখার দুর্বলতা বেশি। অসুখের কথা বললে বেশি টাকা আদায় করা যায়।

ব্যাগ খুলে প্রথমে দুশো টাকা দিয়ে আরও পঞ্চাশটা টাকা যোগ করলো। আর বেশি দিয়ে লাভ নেই, আবার হয়তো পরের সপ্তাহেই আসবে। মনি সব টাকাটা বাড়িতে দেয় কি না তাতে শিখার সন্দেহ হয়।

প্রত্যেকবার ভাইকে টাকা দিতে গিয়ে শিখার চোখে জল আসে।

ওরা তাকে নষ্ট মনে করে, কিন্তু টাকার কোনো পাপ নেই।

দুটো ফিল্মে ছোট খাটো সুযোগ পেয়েছে, একটার টাকা অ্যাডভান্স পেয়েছে আজই দুপুরে। ফিল্মের লাইনটা খুলে গেলে তার নিজস্ব রোজগারের কোনো চিন্তা থাকবে না।

বাড়িতে এসে দেখলো বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বিশ্ব, চোখের সামনে একটা বই। ইদানীং এরকম সময় সে বাড়ি থাকে না।

ও বেলা রান্না করা ছিল, সেই খাবার গরম করে নিল শিখা।

এখন বিশ্ব আর সে এক সঙ্গে খেতেও বসে না। শিখা নিজেরটা খেয়ে নিল আগে। তার খুব খিদে পেয়েছে। শো-এর পরেই তার খিদেতে পেট জ্বলে।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে পাশের ঘরের উদ্দেশে বললো, টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

এবার নিজের ঘরে গিয়ে শিখা জামা-কাপড় ছাড়বে। একা শোবে দরজা বন্ধ করে।

হঠাৎ বিশ্ব ডাকলো শিখা, শোনো।

শিখা কোনো উত্তর দিল না।

বিশ্ব আবার বললো, শিখা, এ ঘরে একবার শুনে যাও!

শিখা বললো, কী বলার আছে বললেই তো হয়! এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি।

বিশ্ব নিজেই উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো।

শিখা শাড়িটা খুলে ফেলেছিল, শুধু শায়া-ব্লাউজ পরা, তাড়াতাড়ি শাড়িটা তুলে আলগা করে জড়িয়ে নিল শরীরে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত এক বিছানায় নগ্ন হয়ে শুয়েছে দুজনে। শিখা নগ্ন অবস্থাতেই বাথরুমে গেছে বেশি রাত্রে। আজ সে

বিশ্বকে দেখে শরীর ঢাকছে।

বিশ্ব একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শিখার দিকে।

ঘরের মধ্যে এক পা ঢুকে বললো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এখানে বসবো ?

শিখা অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো। বিশ্বর কণ্ঠস্বর অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক নরম, এ ভাবে সে বেশ কিছু দিন কথা বলে নি।

বিশ্ব বললো, অনেক ভেবে দেখলাম, এভাবে আর চলে না। মনটা অস্থির থাকলে কাজ-কর্ম করবো কী করে। তাই ঠিক করেছি, আবার আমি সংসার পাতবো।

শিখা উদ্ধত ভাবে বললো, বেশ তো, তোমার যেখানে খুশী, গিয়ে সংসার পাতো। আমি বাধা দিয়েছি নাকি ?

—যেখানে খুশী না, এখানেই।

—ও এখানেই ? আমাকে চলে যেতে হবে ? চলে যাবো ?

—অত রাগ কিসের। একটু তাকাও আমার দিকে। আমি ঠিক করেছি, এ ভাবে আর থাকবো না। তোমাকে বিয়ে করবো।

—কী ?

—হ্যাঁ, বিয়ে করবো। আলপনা ডিভোর্স দিতে রাজি হয়েছে।

বেশ কয়েক পলক জ্বল-জ্বল করে বিশ্বর দিকে তাকিয়ে রইলো শিখা। তারপর প্রাণ ভরে হেসে উঠলো। এমন হাসি, যেন তার সর্বাঙ্গ ফুঁড়ে সেই হাসি বেরুচ্ছে। হাসতে হাসতে মাটিতে বসে পড়লো সে।

বিশ্ব হাসিমুখে তাকিয়ে রইলো শিখার দিকে।

অতিকষ্টে হাসি একটু সংযত করে শিখা জিজ্ঞেস করলো, আমায় বিয়ে করবে ? কেন গো ?

বিশ্ব বললো, কেন আবার কী ? এরপর আর তোমাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। তোমার ওপর আমি কিছুটা অন্যায় করেছি।

—বলো না, কেন বিয়ে করবে আমাকে ?

—বাঃ, বললুম যে। আমরা একসঙ্গে থাকবো। অন্যদের মতন সংসার হবে, বাড়িতে লোকজনদের নেমন্তন্ন করবো।

—কেন বিয়ে করবে ? কেন, কেন, কেন ?

—এ কী পাগলামি হচ্ছে, শিখা! বললাম তো, আগে তোমার ওপর খানিকটা অন্যায় করেছি। এখন সব ঠিক হয়ে যাবে!

—তুমি বিয়ে করতে চাইলেই বিয়ে হবে ?

—তুমি চাও না ? তুমি আমাকে চাও না ?

—তা বলছি না। তোমার ইচ্ছে হলে অন্যায় করবে। তোমার ইচ্ছে হলে ফিরে এসে বিয়ে করতে চাইবে। সব তোমার ইচ্ছেতে হবে ?

বিশ্ব এবার শিখার পাশে বসে পড়ে তার মাথার চুলে হাত রাখলো।

তার সুরেলা গলা গাঢ় করে বললো, এখনো রাগ করে আছো ? লক্ষ্মীটি, আর রাগ করো না। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি। তোমার জন্য আমি নিজের সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

শিখা অনেকখানি বিস্ময়ভরা চোখে বিশ্বর দিকে তাকিয়ে বললো, ভালোবাসা বেশিদিন টেকে না, তাই না ?

—কে বলেছে, টেকে না ? মাঝে মাঝে ছায়া পড়ে। আবার সরে যায়। আর কখনো ছায়া পড়বে না। সামনের মাসেই আমি বিয়ের ব্যবস্থা করবো। আলপনা বাধা দেবে না।

—আলপনাদি খুব ভালো। আমাকে স্নেহ করে। ডেকে ডেকে খাওয়ায়। তিন্নি মেয়েটা কি সুন্দর।

—ওরা তোমাকে মেনে নেবে। তাতে অনেক ঝঞ্ঝাট কমে গেল! আগামী সপ্তাহেই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলছি।

—বিয়ে ? আমার মতন একটা বাজে মেয়ে, কোনো গুণ নেই, সে রকম বলার মতন কিছু বংশ পরিচয় নেই, তাকে তুমি বিয়ে

করবে ? কেন ?

—আমি ওসব কিছু গ্রাহ্য করি না। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, শিখা।

হঠাৎ বিছানার ওপর পড়ে থাকা হাত ব্যাগটা খুলে ঝুটো মুক্তোর মালাটা বার করলো শিখা। বিশ্বর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললো, এই নাও !

সাপ দেখার মতন চমকে উঠলো বিশ্ব। তোতলাতে তোতলাতে বললো, এটা তুমি কোথায় পেলে ?

শিখা খিলখিল করে হেসে বললো, চুরি করিনি। নিজেই এসে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। আমাকে দয়া করেছে। সে আর তোমাকে চায় না !

বিশ্ব গুম হয়ে গেল।

শিখা বললো, তোমার ঐ প্রীতি আমাকে দয়া করেছে। আলপনাদি আমাকে দয়া করেছে। তুমিও দয়া করে হঠাৎ আজ আমাকে বিয়ে করতে চাইছো। সবাই হঠাৎ আমাকে এত দয়া করতে চায় কেন ? আমি বুঝি কারুকে দয়া দেখাতে পারি না ? আমি তোমাকে দয়া করলাম। যাও ! তুমি অন্য যাকে খুশী বিয়ে করো গে !

—কী বাজে কথা বলছো, শিখা। আমি তোমাকেই বিয়ে করবো।

—আমি চাই না !

—তুমি বিয়ে করতে চাও না ?

—না গো না ! তুমি বিয়ে করে আমাকে ধন্য করে দিতে চাও তো ? আমি ধন্য হতে চাই না !

—ওরকম উল্টো পাল্টা কথা বলো না, শিখা ! ঠাণ্ড মাথায় ভেবে দ্যাখো। আমি তোমার জন্য

—আবার দয়া ? আমি দয়া চাই না, চাই না, চাই না !

—বিয়ে না করলে তোমার কী গতি হবে ? নাটকের সামান্য পার্ট, ক'পয়সাই বা রোজগার, এর পরের নাটকে যদি চান্স না দেয়।

পাগলের মত খিল খিল করে হেসে উঠলো শিখা। সমস্ত শরীর তার দুলছে।

বিশ্ব কাছে এসে বসলো। আমার কথায় প্রথমটায় বিশ্বাস করো নি। তাই না? কিন্তু আমি সিরিয়াস। আমি বিয়ে করতেই চাই।

শিখা বললো, কাকে?

বিশ্ব বললো, কাকে আবার; তোমাকে!

শিখা অবুঝের মতো বললো, কেন?

বিশ্ব শিখার কাঁধে হাত রেখে বললো, বারবার ঐ এক কথা। কেন আবার কী? এরপর আর তোমার টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না—

— চুপ!

— একী পাগলামি হচ্ছে শিখা?

শিখা বিশ্বর কাছ থেকে অনেকটা সরে গেল। দেওয়ালে ঠেকে গেল পিঠ। দু' চোখে সমস্ত অন্তরাত্মা এনে বললো, আমার খাওয়া পরার জন্য চিন্তা করছো? আমি অনেক নীচে নেমেছি, আরও নিচে নামতে আপত্তি নেই। আর কিছু না পারি, বেশ্যাবৃত্তি করে খাবো। তবু তো অন্তত নিজেকে বলতে পারবো, অন্তত একদিনের জন্য আমি সকলের দয়া ফিরিয়ে দিয়েছি!

বিশ্ব এগিয়ে এসে তার হাত ধরতে যেতেই শিখা বললো, খবর্দার, আর আমাকে ছোঁবে না।

এবার সে উঠে দাঁড়ালো।

নাটকে যার দাসীর ভূমিকা, সে যেন হঠাৎ হয়ে গেছে রাজরানী। সেই রকম দর্পিত পা ফেলে সে চলে গেল ঘরের বাইরে। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। একটা লম্বা আয়নার সামনে সে একা। কিন্তু এই মুহূর্তে যে দারুণ আনন্দে সে কাঁপছে, সেটা তার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

———